ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 21, No. 2, December 2024

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 21, No. 2, December 2024

'Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas' is a bilingual multidisciplinary **peer reviewed** journal published biannually in June and December since 2003.

- Official journal of the Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India.
- Covers key disciplines of Humanities and Social Sciences like Economics, Political Science, Sociology, Demography, Development studies, Literature as well as Commerce & Management.
- Open to original research articles as well as scholarly review papers.
- Strives to bring new research insights into the process of development from an interdisciplinary perspective.
- Prospective authors will have to follow styles mentioned in the 'Journal Guidelines' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website.

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya, Eminent Author & Ex-Vice Chancelor, Assam University

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty, Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata & Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay, Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das, Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari, Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman, Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Professor (Dr.) Biswajit Mohapatra, Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Professor (Dr.) Paramita Saha, Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Professor (Dr.) Prasad Serasinghe, Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Editor-in-Chief :

Dr. Dipankar Ghosh

Executive Editors :

Dr. Bhabesh Majumder (bmsrlm.100@gmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty (shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যচর্চা
অশোক বিশ্বাস 3

শরৎ উপন্যাসের নাট্যায়ন
অমলচন্দ্র সরকার 18

বিভূতিভূষণ ও নারী-নিসর্গবাদ : নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা
পূজা ভুঁঞে 25

জয়া গোয়ালার ছোটগল্প : প্রান্তিক মানুষের স্বর ও সমাজবাস্তবতার নির্মম চিত্র
রিয়াঙ্কা দেবনাথ 33

Changing Dimensions of India's National Security
Sachin Kumar Verma, Vishal Panday, Sumit Gupta 44

Use of Artificial Intelligence in the Accounting Profession
Supriyo Kumar Saha 60

OPEN EYES

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যচর্চা

অশোক বিশ্বাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা ধারাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। আপন আপন প্রতিভার বলে এবং লেখনির চমৎকারিত্বে তা স্বমহিমায় ভাস্বর থেকেছে দিনের পর দিন—আজও। এরকম এক সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার প্রতিভূ সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা, পঞ্চম সন্তান; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি। ১৯৪৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালের ৩০ শ্রাবণ রবিবারের শেষ রাতে, ব্রহ্মমুহূর্তে ৪-১০ মিনিটে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৮৭৫ সালে ঠাকুরবাড়ির অশ্বত্থসম মাতৃছায়া সারদা দেবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হলে পরিবারের অন্তপুরের সমস্ত দায়িত্ব এসে চাপে সৌদামিনীর ওপর। বোনেদের চুল বাঁধা থেকে শুরু করে ফুল কেটে আলপনা দেওয়া, বাড়ির মেয়ে-বৌদের রান্না শেখানো ও পিতৃদেবকে রান্না করে খাওয়ানো এবং পরম যত্নে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করা সবটাই সৌদামিনী দেবীকে সামলাতে হত। তিন-তিনটি সন্তানের (ইরাবতী, ইন্দুমতী ও সত্যপ্রসাদ) মা হয়ে তাদেরকে পরম আদরে মানুষ করা, শিক্ষিত করে তোলা এবং একই সঙ্গে অন্দরমহলের সকলের মন যুগিয়ে চলা বাস্তবিকই এক মহীয়সীর পরিচায়ক। জনৈক গবেষিকার মতে—

> "দেবেন্দ্রনাথের যে মেয়েরা অন্দরমহলেই থেকেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠকন্যা সৌদামিনীই ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলে নিজের মানসক্ষমতার অসামান্যতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।"[১]

তৎকালীন সমাজের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির স্বাধীনচেতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষদের মতাদর্শে সেই ঘেরাটোপ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিশেষকরে নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে মেয়েদের বহির্বাটিতে বিশেষকরে পাঠশালাতে অধ্যয়নের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। আর সেই প্রশস্ত পথে প্রথমে পা বাড়ালেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সৌদামিনী দেবী : "পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি পেশোয়াজ পরে খুড়তুতো বোন কুমুদিনীর সঙ্গে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হলেন।"[২]

১৮৫১ সালের ৮ই জুলাই পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় মেয়ে সৌদামিনীকে ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখে একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—"আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে ফল কি হয়।"[৩] অবশ্য এর পূর্বে স্বগৃহে সৌদামিনী দেবীর এক বৈষ্ণবীর কাছে হাতেখড়ি হয়। এক বিদেশিনী মিস্ গোমস্‌কে রেখেছিলেন গৃহশিক্ষিকা হিসেবে। তাঁর আত্মজবানীতে—

> "আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর

বিশ্বাস, অশোক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যচর্চা
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 21, No. 2, December 2024, Pages : 3-17, ISSN 2249-4332

হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন।"[৪]

সৌদামিনী দেবীর বেথুন স্কুলে ভর্তির বিষয়টা ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে তদানীন্তন একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে (The Calcutta Christian Observer) এ যেভাবে ছাপানো হয় তা নিম্নরূপ :

> "One of the most influential natives in Calcutta, Debendernauth Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in the Institution, and the Raja Kali Krishna Bahadur, who occupies the prominent position in Hindu society in the metropolis has accepted the office of its president."[৫]

সৌদামিনী দেবী যখন বেথুন স্কুলে ভর্তি হন, তখন ১৮৫১ সাল। নিতান্তই চার কি পাঁচ বছরের বালিকা। স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। এ বিষয়ে স্বয়ং সৌদামিনী দেবীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—

> "কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যেমশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন। তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও কয়েকটি মেয়েকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প কয়টি মাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।"[৬]

তাহলে এ কথা পরিষ্কার যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে সৌদামিনী দেবীই প্রথম, যিনি বহির্বাটিতে শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হলেন। প্রশস্ত হল স্ত্রী শিক্ষার পথ।

ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ঘরজামাই ছিলেন। নদিয়ার দিগনগর গ্রামের যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সারদাপ্রসাদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮৫৬ সালে। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৫৯ সালের ১৬ই অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সত্যপ্রসাদ একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন। সেই দিক থেকে উভয়েই একে অপরের সহপাঠী; সতীর্থ। কন্যা ইরাবতী (১৮৬২-১৯১৪) ও ইন্দুমতী। ইরাবতী ইন্দু নামেও পরিচিত। একদা রবীন্দ্রনাথের বাল্যসঙ্গীও ছিলেন তিনি। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে জমিদারি দেখাশোনা করতেন। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী দেবীর বিবাহের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। বিধির কি নিষ্ঠুর বিচার—একদিকে শুভ লগন অন্যদিকে মৃত্যুর অশুভ সংবাদ।

সৌদামিনী দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বঙ্গসমাজ সংস্কৃতির নানা কথা ও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কদর্য চেহারা উঠে আসে সঙ্গত কারণেই। চিত্রা দেব 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে বলেছেন—ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের খোলা ছাদে বেড়ানো সমাজ খারাপ চোখে দেখতো। কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকতে হতো মেয়েদের। জোড়াসাঁকোর পার্শ্ববর্তী চন্দ্রবাবুর কথার মধ্যে দিয়ে তাই স্পষ্ট হয়—"দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরে, খোলা ছাতে বেড়ায় আমরা দেখতে পাই, আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?"[৭] সৌদামিনী দেবী স্বয়ং বলেছেন—"আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোশাক পরিয়া

প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। আমরা মেয়েরা সেইদিন তেতলার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম।"[৮] সমাজ ব্যবস্থার এই কঠিন অনুশাসন থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েদের পক্ষে প্রকৃতপক্ষেই অসাধ্য সাধন বলা চলে। তারপর সাহিত্য সাধনা, চর্চা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কি!

সৌদামিনী দেবী সাহিত্য চর্চায় বিস্তৃত পথ অতিক্রম না করতে পারলেও তাঁর কিছু ভ্রমণ কথা, অনুবাদ সাহিত্য, স্মৃতিকথা এবং সংগীত আমাদের সম্মুখে নতুন পথের দিশা উন্মোচন করে। তাঁর সৃষ্টিসম্ভার থেকে আমরা যে ক'টি ভ্রমণকথার নিদর্শন পাই তার অধিকাংশই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংগীত রচয়িতা হিসেবেও সৌদামিনী দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি ব্রহ্মসংগীত—'(প্রভু) পূজিব তোমারে'—সমগ্র ব্রহ্ম সংগীত প্রেমীদের কাছে অমূল্য রতন। স্মৃতিকথা—'পিতৃস্মৃতি'। স্মৃতিকথা গ্রন্থের ধারায় এক অনুপম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে যে প্রাকৃতিক চিত্রের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তাতে তাঁর কবি-মানস যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমনি এক সংবেদনশীল মনের পরিচয়ও স্ফুট হয়।

সৌদামিনী দেবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ—স্মৃতিকথা 'পিতৃস্মৃতি'। এই একটি গ্রন্থের জন্যই তিনি বাংলা স্মৃতিকথার ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবিদিত হয়ে আছেন। এবার আমরা সেই আলোচনায় ব্রতী হতে পারি।

'পিতৃস্মৃতি' প্রবাসী পত্রিকায় তিনটি পর্বে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্ব ফাল্গুন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় পর্ব চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। এবং তৃতীয় পর্ব জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকান্তরের অব্যবহিত পরে লিখিত হলেও নানা অনুষঙ্গ ধরে পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও এসেছে নানা সময়ে। তবে পিতৃদেবের কথাতেই যে লেখিকা বিভোর বিহ্বল থেকেছেন ক্ষণের পর ক্ষণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিবিধ প্রসঙ্গে এসেছে সেই সব চিত্র।

একদা পিতৃদেব সিমলায় গেছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোন সংবাদ পাঠাননি বা চিঠিপত্র লেখেননি। তাই নিয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল যেভাবে চিন্তায় ভারাক্রান্ত থেকেছেন এবং বিবিধ ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন তা এইরূপ :

> "তিনি সিমলায় যাইবার দিনকয়েক পরেই সিপাই-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অনেকদিন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব,—বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।[৯]

সৌদামিনী বলেছেন এমনই এক ভয়ানক দিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু স্বল্পকাল বিলম্বে পিতৃদেবের পত্র হাতে পাওয়াতে সেই ভয়াতঙ্ক অপসৃত হয়।

'পিতৃস্মৃতি' আমাদের সম্মুখে হাজির করে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল এবং বাহিরমহলের নানা তথ্য, সংবাদ, খুঁটিনাটি এককথায় প্রাত্যহিকী। প্রত্যেক সদস্য-সদস্যার কথা সেভাবে ব্যক্ত না হলেও সৌদামিনী পূর্ব, সৌদামিনী সমকালীন এবং সৌদামিনী উত্তর অনেক সদস্যের কথাতে সিক্ত থেকেছে উক্ত স্মৃতিকথা। অত্যন্ত দরদ ও স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর জীবনের অমূল্য রতন পিতৃস্মৃতি। ক্ষণে ক্ষণে পিতৃস্মৃতির কথা বিষয়ান্তরে গেলেও ক্ষণিকেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তার। পিতৃস্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি সৌদামিনী দেবীর নিপুণা গৃহিনীপনার কথা।

পিতৃস্মৃতি আমাদের নিকট উন্মোচন করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহৃদয়তা, মমত্ববোধ। তাঁর অন্তকরণে যে নারী জাতির জন্য বিশেষ সম্মান পুঞ্জিভূত ছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে তা প্রতিফলিত :

> "স্ত্রীলোকদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। যে কোন মহিলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সকলকেই মাতৃ সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত যত্ন আদর করিতেন। তাহারা যে যেমন কথা শুনিতে আসিতেন সকলকে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের হৃদয়পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিতেন।"[১০]

অন্তপুরে অভিনয়ের ব্যাপারেও মহর্ষির সদর্থক মনোভাব ছিল। বাটি অভ্যন্তরের সকল সদস্যই মনে করতেন মহর্ষির অভিনয় শিল্পটা ভালো লাগেনা; তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির সকলের সেই আতঙ্কিত মনোভাব স্বল্প দিনের মধ্যেই কেটে যায়। মহর্ষি কৃত্রিম উপাসনা প্রথা এবং কৃত্রিম শাসনপ্রথাকে কোনদিন মান্যতা দেননি।

সৌদামিনী দেবী তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এমনভাবে পিতৃকথাতে বিভোর বিহ্বল থেকেছেন, গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে আমাদের মনে হবে তা যেন চিত্রের মালা। সেই চিত্রের প্রকৃতিতে যেমন আছে মায়া তেমনি ভয়। আবার যেমন অপার স্নেহ তেমনি ক্ষোভ। পিতৃস্মৃতি আমাদের সামনে তুলে ধরে মহর্ষির ধর্মবোধ। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে, অর্থ উপার্জন করে তাদের প্রতি মহর্ষি কোনদিনই সহৃদয়তা প্রকাশ করেননি। নিম্নোক্ত কথাতে তা স্পষ্ট :

> "যাহারা অর্থলোলুপ হইয়া ধর্ম্মকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, মন্ত্র পড়ায় কিন্তু মন্ত্রের অর্থই জানে না, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যাহাদের কোন লক্ষ্যই নাই, তাহাদিগকে ভক্তি করিয়া ভক্তির অবমাননা করা হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি।"[১১]

'পিতৃস্মৃতি' থেকে আমরা তদানীন্তন বঙ্গ সমাজের কঠোরতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লব্ধ হই। সেই সময় সমাজের কী নিয়ম বিধি ছিল তা জানতে পারি। বিশেষকরে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত ঠাকুরবাড়িতেও যে রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থার বীজ প্রোথিত ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই বিধি নিষেধ একমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই বলবৎ ছিল। মহর্ষির মেজ পুত্র আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই রুদ্ধদশা থেকে পরিত্রাণের কথা বলেছিলেন, সে কথাও লিপি পেয়েছে এখানে :

> "মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে ঢাকাদেওয়া পাল্কিতে যাওয়াই রীতি ছিল—মেয়েদের পক্ষে গাড়িচড়া বিষম লজ্জার কথা বলিয়া গণ্য হইত। একখানি পাতলা সাড়ি মাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল।"[১২]

সৌদামিনী দেবীর আত্মজবানীতে—

> "বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতালার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম। তখন বন্ধন এমন কঠিন ছিল যে পুরাতন চাকর ছাড়া বাহিরের অন্য কোন পুরুষ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। মেজদাদা সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।"[১৩]

মেজ বৌদিমণি জ্ঞানদানন্দিনীর কথাও বলেছেন সৌদামিনী দেবী তাঁর গ্রন্থে। প্রসঙ্গান্তরে নানা অনুষঙ্গ ধরে 'পিতৃস্মৃতি' ঠাকুরবাড়ির অনেক বিদূষী, মহীয়সীর কথা বলেছে। বলেছে শিল্প সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের কথাও। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথা প্রসঙ্গে সৌদামিনী দেবী বলেছেন—"মেজ বৌঠাকুরাণীই বম্বাই ধরণের শাড়ি পরা আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন"[১৪] তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে আধুনিক চেতনায় শিক্ষিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই সর্বপ্রথম বম্বাই ধাঁচে ঠাকুরবাড়িতে শাড়ি পরার স্টাইল চালু করলেন।

মহর্ষি কোনরূপ অপব্যয়কে পছন্দ করতেন না। তাঁর ভাষায় অপব্যয় মস্ত বড় একটা অব্যবস্থা। এই অপব্যয়কে

তিনি কুৎসিত আখ্যা দিতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পরিধেয় কাপড় আসত ফরাসডাঙ্গা থেকে। সেই কাপড়ে কোনরূপ জড়িজড়াও থাকবে না—মহর্ষির নির্দেশ ছিল। শীতকালে গায়ে গরম জামা কাপড় পরার নিয়মও ছিল না মহর্ষির নির্দেশে। তাই সৌদামিনী বলেছেন সংবৎসরের শীত তাদের পাতলা জামা কাপড় পরেই যাপন করতে হতো।

'পিতৃস্মৃতি'তে আছে মহর্ষি তাঁর মেয়েদের নোলক পরাকে মান্যতা দেননি। তাঁর ভাষায় মেয়েদের নোলক পরা মানে বর্বরোচিত আচরণের সঙ্গে আপোষ করা। যেটা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ—"এ কি সং সাজিয়াছ! যাও যাও খুলিয়া ফেল! বন্য বর্ব্বররাই ত নাক কান ফুঁড়িয়া গহনা পরে—এ কি ভদ্রসমাজের যোগ্য!"[১৫]

'পিতৃস্মৃতি' থেকে আমরা জানতে পারি মহর্ষির সকল কাজ ঘড়ি ধরে সম্পন্ন হত। অর্থাৎ নিয়মের কোন ব্যতিরেক ঘটতো না। ইনি সামান্য পরিমাণ দেনাকে ভয় করিতেন। ছেলেরা কোন ঋণ করে তাঁকে সাহায্যের জন্য ধরলে তিনি নিদারুণভাবে বলতেন—আমি কি কেবল ঋণ শোধই করব। বাড়িতে সমস্ত কাজ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা পাকা করেন। সকাল ছয়টার সময় যখন ঘণ্টা বাজবে তখন প্রত্যেকে শয্যা পরিত্যাগ করে হাতমুখ ধোওয়াতে প্রস্তুত হবে। সাতটার ঘণ্টায় দালানে গিয়ে প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দিতে হবে। বেলা দশটার ঘণ্টা পড়লে স্নানের জন্য তোড়জোড় করতে হবে। মধ্যাহ্নে বারোটার ঘণ্টা বাজার অর্থ হল সবাই আহার সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি নাও। দুপুর চারটের ঘণ্টা বাজলে ছেলে মেয়েরা স্কুল শেষ করে বাড়ি এসে আহারাদিতে বসবে। সন্ধ্যা পাঁচটার ঘণ্টা নির্দেশ করে কাছারি বন্ধ হওয়ার। আর রাত্রি দশটার সময় যে ঘণ্টা বাজবে তখন প্রত্যেকে শয়নের জন্য তৈরি হবে।

এ কথা পূর্বেই বর্ণিত যে 'পিতৃস্মৃতি' পিতার কথাতে সম্পৃক্ত; পিতার জীবনেতিহাসের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তথাপি নানা প্রসঙ্গ ধরে অনেক বিবরণ এখানে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় পরিস্ফূট। তাছাড়া পিতার কথা বলতে গিয়ে মাতার কথা বা প্রসঙ্গ আসবে না তা কি কখনো হয়! এরকমই একটি চিত্রের বর্ণনা সৌদামিনী দেবী পাঠকশ্রেণিকে উপহার দিয়েছেন। যে মাতৃমূর্তিতে ধরা আছে পিতার জন্য অপার ভালোবাসা। যে মাতৃমূর্তিতে উদ্ভাস ঘটেছে সতীসাধ্বী পতিব্রতা নারীর কমলগন্ধার কোমল স্বরূপ :

> "মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্ব্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্ব্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই তিনি বাড়িতে থাকিতেন না—এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন—কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জ্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন তিনি বাহির হইতেন না।"[১৬]

বহু প্রসবিনী মায়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে 'পিতৃস্মৃতি'তে। বর্ণিত হয়েছে সন্তানের প্রতি মায়ের অনাদর এবং অযত্নের কথা। সৌদামিনীর ভাষায়—

> "আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালোবাসিতেন, তাঁহার 'পরেই আমাদের যত আবদার ছিল।"[১৭]

পিতা মাতার বৈবাহিক জীবনের কথাও 'পিতৃস্মৃতি'তে আলোকিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে। মহর্ষি কত বছর বয়সের সারদাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন সেই কথাও লিপিবদ্ধ এখানে। মহর্ষির প্রতি সারদাদেবীর শেষনিশ্বাস পর্যন্ত যে

ভক্তি তাতে আমরা অভিভূত হই। আবার পক্ষান্তরে প্রাণপ্রিয়া সহধর্মিনীর জন্যও মহর্ষির মন কেমন করে উঠত, সারদা দেবীর মৃত্যুর দিন সে কথা স্পষ্ট হয়। এমনই এক উদ্ধৃতি এই স্থলে করা যেতে পারে—

> "মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।"[১৮]

ঠাকুরবাড়িতে সরস্বতী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা নানাবিধ অনুষ্ঠানাদি, সারদা দেবীর গরু পোষা, বিবাহের পিঁড়িতে আলপনা কাটা, প্রতিভার পিয়ানো বাজানো, রবির গানে মনোনিবেশ করা, ইত্যাদি বিচিত্র চিত্রের সমাহার 'পিতৃস্মৃতি'। পুত্র রবীন্দ্রনাথের গানে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি বলতেন—"রবি আমাদের বাঙ্গালা দেশের বুলবুল।"[১৯]

ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা ভালো করে কাপড় পরতে পারতেন না। অথচ তারা পরার জন্য ব্যাকুল হতেন। মহর্ষির ঘোর আপত্তি ছিল এ বিষয়ে। পিতৃস্মৃতিতে সৌদামিনী দেবী এই ব্যাপারটি যেভাবে তুলে ধরেছেন :

> "ছোট মেয়েরা ভাল করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের সাড়ি পরা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দর্জ্জি ছিল—পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানা প্রকার পোষাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোষাক অনেকটা পেযোয়াজের ধরণের হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সেজ এবং ন' বোন অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারিদিক হইতেই মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন।"[২০]

জোড়াসাঁকো বাড়ি ছাড়াও মহর্ষির চুঁচুড়াতে আরেকটি বসতবাড়ি ছিল। সেখানেও কালেভদ্রে তিনি অহর্নিশ যাপন করতেন। একদা চুঁচুড়ার বাড়িতে স্থিতিকালীন মহর্ষি গভীর পীড়ার সম্মুখীন হন। এবং শুশ্রূষার নিমিত্ত সৌদামিনী স্বয়ং ও তার ন' বোন সত্ত্বর তথায় পৌঁছান। সৌদামিনী দেবীর ভাষায়—

> "চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয় তখন আমি আর আমার ন' বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম।"[২১]

সৌদামিনী দেবীর উদ্দেশে অনেকেই কলম ধরেছেন। ব্যক্ত করেছেন তাঁর অপার মহিমার কথা। অনেকে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন মুহূর্মুহু। তাঁর স্নেহের ছায়ায় প্রাণ জুড়িয়েছেন অন্দরমহলের অনেকেই। একমাত্র অবলম্বন ও হাতের পাঁচ জ্ঞান করেছেন বেশ কয়েকজন। যাইহোক মোদ্দাকথা ঠাকুরবাড়ির অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি। তাইতো তাঁর প্রশংসার বাণী অনেকের মুখে উচ্চারিত।

পিতৃদেব মহর্ষির কথা আর কি বলার আছে! তাঁকে কেন্দ্রীভূত করেই তো 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের অবতারণা। জীবনভর সৌদামিনী দেবী তাঁর কথায় কথার মালা গেঁথেছেন। পক্ষান্তরে মহর্ষিও জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি অগাধ স্নেহ নিঙড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সৌদামিনীকে 'গৃহরক্ষিতা' বলতেন ঠিকই তথাপি তাঁর কঠোর হৃদয়, কঠিন অনুশাসনে বাঁধা মন মেজাজ কখনো কখনো মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। অন্তকরণ থেকে উৎসারিত বাৎসল্য প্রেম কখনো কখনো মেয়ের জন্যও ধাবিত হত। আজীবনকাল পিতৃগৃহে কাটানোর সুবাদে তা যেমন প্রকাশ্য তার থেকেও বড়মাত্রায় পরিস্ফূট মেয়েকে স্বহস্তে লেখা দেবেন্দ্রনাথের দুটি পত্র। ৪ঠা মাঘ ৫২ ব্রা : শক্ এ দেহরাদুন থেকে লিখছেন প্রথম পত্রটি। যেখানে সৌদামিনীকে 'প্রাণ প্রতিমাসু'— বলে সম্বোধন করেছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। পত্রটির এক প্রস্থ এইরূপ—

> "তোমার আত্মাতে দেব ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াই আমাদের গৃহদেবতা পরম দেবতার নিকটে প্রতিদিন

বাড়ীর সকলকে উপস্থিত করিবার ভার তোমাকে দিয়াছি। ইহা অতি গুরুতর ভার তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়িতে এখন যে আসুরিক ভাবের প্রবলতা, ইহাতে তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহাতে আমার বড় আশা নাই।"[২২]

এই পত্রাংশের সারকথা এই যে—পিতা, কন্যার মধ্যে দেবতার ওপর অগাধ অতলান্ত ভক্তির প্রতিচ্ছবি উপলব্ধি করেছেন। এই দেবভাবের স্ফূর্তির দ্বারা অন্দরমহলের সকলকে তিনি ভক্তিবিমুখ উন্মত্ত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবেন। এটা একটা গুরু দায়িত্ব। এবং এই দায়িত্বে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করবেন সে বিষয়েও দেবেন্দ্রনাথ একপ্রকার সন্দিহান ছিলেন। অর্থাৎ মোটকথা মহর্ষি ঠাকুরবাড়ির আর কারোর ওপর এতটা ভক্তিপ্রবণতা দেখেননি যতটা সৌদামিনী দেবীর মধ্যে দেখেছিলেন।

পত্রের আরেক প্রস্থ; শেষাংশ :

"তুমি সম্প্রতি অসহায় অবস্থাতে জ্বররোগে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলে অথচ তাহাতে একটি বাক্যস্ফূটও কর নাই। এ কি তোমার অসাধারণ ধৈর্য্য। অন্তর্যামী ঈশ্বরই তোমার সহায়। তিনিই তোমাকে সংসারের দাব-দাহ মধ্যে রক্ষা করুন এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমার স্নেহার্দ্র হৃদয় তোমাকে দিলাম।"[২৩]

—এই উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, সৌদামিনী দেবী অত্যন্ত আত্মসংযমী ছিলেন। অত্যুক্তি করে বলা যায় প্রাণ গেলেও কাউকে অনুনয় করতেন না। অবর্ণনীয় অতলান্ত ব্যথার অনল তাঁর অন্তরকে পুড়িয়ে ছাই করলেও তিনি অব্যক্ত থাকতেন। এ এক নিদারুণ সহনশীলতার পরিচয়। পক্ষান্তরে পিতা দেবেন্দ্রনাথও বড় মেয়েকে এক সীমাহীন স্নেহে ভরিয়ে রাখতেন। যা বলাই বাহুল্য।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছেন সৌদামিনীকে ১লা শ্রাবণ ৫৪তে। মসুরী পর্বত থেকে। এই পত্রে সৌদামিনীকে 'স্নেহময়ি সৌদামিনি' বলে সম্বোধন করেছেন। উক্ত পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল—"তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ-অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্ব্বত গম্ভীর স্বরে বলিতেছে—

We rear our mighty fronts towards Haeven ;
Where foot of mortal never trod ;
For we alone of nature's work
Are chosen children of our God.
Ye verdent meads, ye flowing streams,
Ye in creation have your place,
Lo ! He that made you deemed you good ;
But only we have seen His face.

এই পর্ব্বতের উপরে আজ কাল মেঘ বাতাস, বিদ্যুৎ বজ্র মুহুর্মুহু আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল—আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিল, যেন একেবারে সকল সৃষ্টির লোপ হইল— আবার পরক্ষণেই সম্মুখে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণে বনরাজি দীপ্ত পাইতে লাগিল। ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই,

তাঁহার মহিমার অন্ত নাই। তাঁহার মহিমা যখন দেখিতে থাকি তখন সকলি আর ভুলিয়া যাই।** ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ। ইতি।"[২৪]

ইন্দিরা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর একমাত্র কন্যা। পিসিমা-সৌদামিনী দেবীর প্রসঙ্গে অনেক দরদভরা কথা বলেছেন। যা তাঁর স্মৃতিকথা 'স্মৃতিসম্পুট' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে নানা অনুষঙ্গ ধরে পিসিমা সম্বন্ধে নানান খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন। যে টুকরো টুকরো ঘটনার ঘনঘটায় ও খণ্ড স্মৃতির সারণী বেয়ে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে, তাতে সৌদামিনী চরিত্রটি আরো জীবন্ত আরো সাবলীল আরো সতেজ হয়ে ওঠে। আরো মহীয়সী আরো স্নেহের মূর্ত প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। স্মৃতিসম্পুটে বর্ণিত ইন্দিরা দেবী, মা জ্ঞানদানন্দিনীর মুখে বড় পিসিমার সুখ্যাতি শুনেছেন। মা বলতেন ঠাকুরবাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসে নাকি পিসিমার কাছেই বেশি আদর যত্ন ও সান্ত্বনা পেয়েছেন। মা পিসিমার সম্পর্কে বলতেন তিনি বেথুন স্কুলের প্রথমা ছাত্রীদের অন্যতমা ছিলেন। আকারে ছোটখাটো। সাদা ধবধবে। কিন্তু আন্তরিক গঠনে বৃহদাকার। বউ হয়ে আসার পর শেষ পর্যন্ত নাকি মা কাকিমারা তাকে দাদা মশায়ের সেবা যত্নেই রত থাকতে দেখেছেন।

ইন্দিরা দেবীর 'স্মৃতিসম্পুট' এ বর্ণিত হয়েছে বড় পিসিমার দুই মেয়ে—ইরাবতী ও ইন্দুমতীর কথাও। তাদের বিবাহের বৃত্তান্ত। বর্ণিত হয়েছে তাদের পরিধেয় বেশভূষা এবং আহারাদির খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করা হয়েছে সৌদামিনীর দুই জামাইয়ের চলন-বলন ও দৈহিক তথ্যাদি। আলোকিত হয়েছে ইরাবতী ও ইন্দুমতীর একমাত্র ভাই সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও।

সৌদামিনীকে নিয়ে সোহাগ-আদরের কথা প্রকাশ করতে ভোলেননি আদরের ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যান্যদের মতো তিনিও বাৎসল্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্ত করেছেন ভালোবাসায় গাঁথা অমলিন, চিরভাস্বর মধুমাখা স্মৃতি। যা কখনো কারো বিস্মৃত হবার নয়। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রটির দ্বিতীয়াংশ দিদি-ভাইয়ের সেই অপার স্নেহ-মায়া-মমতার ক্ষণসমূহের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এখানে তাই লিপিবদ্ধ করা হল—

"কাছে থাকি দূরে থাকি দেখ আর নাহি দেখ
শুধু স্নেহ দাও,
স্নেহ করে ভালো থাক স্নেহ দিতে ভালোবাস
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাক আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
স্নেহ পারাবার—
প্রভাতশিশির সম নীরবে পরাণে মম
ঝরে স্নেহধার।
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়—

নীরবে বিমল হাসি উষার কিরণরাশী
প্রাণেরে জাগায়।"[২৫]

আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৌদামিনীকে চিত্রাঙ্কন করতে ভুল করেননি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অজস্র লোকের ভিড়ে যে বাড়ি জনারণ্য, বিচিত্র শব্দের ভিড়ে যে বাড়ি মুখর, জহরীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয়, নয়নের মণি, ঠাকুরবাড়ির প্রাণভোমরাকে অন্বেষণ করতে ভুল করেননি তিনি। সবচেয়ে জনপ্রিয়, নয়নের মণি ঠাকুরবাড়ির প্রেমভোমরা মানুষটি কে তা বুঝতে আমাদের কোনরূপ বেগ পেতে হয় না। তিনি নিশ্চিতভাবে সৌদামিনী দেবী। বিশুদ্ধ ভালোবাসার রং চড়িয়ে এক মোহনীয় অকৃত্রিমতার আবেশে তাঁকে চিত্রায়িত করেছেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

> "মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে আমাদের বড়দিদি সৌদামিনীর কথা। ছোট্ট মানুষটি ছিলেন, একেবারে সাদা পাথরের মত রঙ। একটা পাটকিলে রঙের কাবুলী বেড়াল ছিল তাঁর বড়ো আদরের, আর ছিল তাঁর বহুদিনের পুরনো চাকর ব্রজ।"[২৬]

সৌদামিনী দেবী নাকি প্রত্যহ সৌমেন্দ্রনাথকে উপাসনা করতে নিয়ে যেতেন। ৬ ই মাঘ তারিখে মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হত। সকালবেলা দিদি দালানে গিয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাঁর চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ত। সৌমেন্দ্রনাথের জবানীতেও ধরা আছে মহর্ষির মৃত্যু পর্যন্ত সেবা করেছেন বড়দিদি। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত বারান্দায় পায়চারি করতেন তিনি। কোনো কোনো দিন তাঁকে দুহাতে উঠিয়ে নিয়ে বারান্দার এক মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতেন। এ প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে যা লিপিবদ্ধ তা এইরূপ—

> "হাল্কা ছিলেন যেন শোলা। নবান্নের দিনে নবান্ন তৈরি করে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন বড়দিদি। ভাইফোঁটার দিন সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ যেতেন বড়দির ঘরে ভাইফোঁটা নিতে। বিয়ের পরেও তিনি কখনো শ্বশুর বাড়ি ঘর করতে যাননি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই তাঁর জীবন আরম্ভ হল, শেষও হল।"[২৭]

সংসার নামক মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত থেকেও সৌদামিনী দেবীর মন কখনো কখনো আনমনা হয়ে উঠত। হৃদয়ের প্লুত প্রদেশে রাগিনীরা বাসা বাঁধতো সুরের নিমিত্ত। এক অদম্য আবেশে সপ্তসুরে গলা চড়িয়ে দিতেন কখনো কখনো। সৌদামিনী কতগুলি ব্রহ্মসংগীত গেয়েছিলেন তার সঠিক অংক নির্ণয় করা এখনও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীতটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"(প্রভু) পূজিব তোমারে আজি, বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয়-কপাট খুলি পেতেছি মন-আসন।
ভক্তিতে গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন-ছিটা, এইমাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময়, ভক্তে দিবে দরশন।
এস তবে দীনবন্ধু, এস করুণার সিন্ধু
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন।।"[২৮]

উপরোক্ত ব্রহ্মসংগীতের থেকে অবগত হওয়া যায় সৌদামিনী দেবী প্রভুকে অহোরাত্র পুজো করতেন। হৃদয়ের

দরজা উন্মোচন করে দিয়েছেন তাকে চিরতরে হৃদয়াসনে বসাবেন বলে। ভক্তিভরে মালা গেঁথে চন্দনের সহিত প্রভুর কণ্ঠদেশে রাখবেন। আর নয়নবারি দিয়ে প্রভুর চরণ ধৌত করবেন। অগাধ বিশ্বাস হেতু তিনি কখনই ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূরণ করবেন না। এই প্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর, আরাধ্য দেবতা, অন্তর্যামী তা আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি এমনই ছিল তাঁর বিশ্বাসের জগৎ।

সৌদামিনী দেবীর সাহিত্য প্রতিভার আরেক নিদর্শন হল 'অদ্ভুত রামায়ণ'। পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন এই গ্রন্থের পরতে পরতে। পয়ার ভিন্ন বাংলা অন্যান্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন তিনি। বহু চর্চিত রামায়ণ গ্রন্থ হঠাৎ লিখতে গেলেন কেন। তাহলে কি ব্যাখ্যানে ও অভিনবত্বে অন্যমাত্রা সংযোজন করেছেন? নাকি ভিন্ন দিশা উন্মোচন করেছেন আমাদের সমীপে। এরকম বিবিধ প্রশ্নের তীরে আমরা বিদ্ধ হই। সৌদামিনীর ভাষায় রামায়ণ ভারতের মহামূল্যবান একটি গ্রন্থ। যাইহোক সৌদামিনী দেবী 'অদ্ভুত রামায়ণ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে যা লিখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"ক্রাউন্ অফ্ ইণ্ডিয়া।
মহামহিমাবোপমা মাদৃশ সুদীন বিধবাকন্যা
পালিকা স্বদেশহিতৈষিণী, কল্পলতিকা—
সদৃশী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া
মাদৃশ নিরাশ্রয়ী বিধবাকন্যাপালিকাসু।

সবিনয় নিবেদন।

মাতঃ! আমি বহু যত্নে এবং বহু চেষ্টায় মহামুনি বাল্মীকির সর্ব্বস্বধন এই অদ্ভুতরামায়ণ গ্রন্থখানি নানাবিধ বাঙ্গালা ছন্দে রচনা করিয়াছি। ইহা ভক্তগণের পরমবস্তু, মুমুক্ষুর ভব-সমুদ্র-তরণী, ধার্ম্মিকের পরমবন্ধু, আর্য্যগণের আদরের ধন, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন। ইহা যেরূপ ভাবে ভাষান্তরিত হওয়া উচিত, আমা দ্বারা তাহার কতদূর হইয়াছে, তাহা আমি জানি না, তবে এই মাত্র ভরসা, "রামনাম মাধুর্য্যবিচীন নহে। এই নামে ভক্তবৃন্দের হৃদয় বারিধি সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমি এই ভরসাতে সাহসী হইয়া, এই রামনামাত্মক মহাকাব্য ভাষান্তরিত করিয়া একগাছি মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক আপনার গলদেশে ভক্তিভাবে প্রদান করিবার নিমিত্ত নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। একবার হৃদয়দেশে ধারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। মাতঃ! আমি সামান্য জ্ঞান-সম্পন্না, ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। আমি অল্প দিন হইল বিধবা হইয়াছি। এ হতভাগিনীর আর কেহ কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটী বালিকা লইয়া অকুল দুঃখসমুদ্রে ভাসমান। উদরান্নের অন্য কোন উপায় নাই। বিষয় নাই, বিভব নাই। কাজেই গ্রন্থাদি রচনা অথবা দাসীবৃত্তি ভিন্ন উপায় কি আছে? দ্বিতীয় পন্থাপেক্ষা প্রথম পন্থাবলম্বনে নিকটে উপস্থিত হইলাম। নব-বিধবা-তরুণী কুলবালাকে কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ বিতরণে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। আমার ন্যায় কত শত রমণী আপনার কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছে, তবে কেন আমি তা হইতে বঞ্চিত হইব। পুস্তক উৎসর্গচ্ছলে জীবন উৎসর্গ করিলাম, প্রতিপালন করতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি।

শরণাগতা নববিধবা

সন ১২৯৭ সাল।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

জ্যৈষ্ঠ।

শিবপুর হাওড়া"[২৯]

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে মহিলার অধিকাংশ জীবন কেটে গেছে গৃহের অন্তপুরে, সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ভিড়ে যার নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম, যিনি মহর্ষি পরিবারের গৃহরক্ষিতা হিসেবে থেকে গেছেন আজীবন তিনি আবার কখন ভ্রমণে বের হলেন! কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধরে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমাদের নজরে আসে তাঁর বহির্বাটিতে যাওয়ার চিত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মস্থলে সৌদামিনী ছিলেন প্রায় এক বছর। আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও সৌদামিনীর প্রবাস জীবন ধরা পড়ে। 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ বড়দিদি সৌদামিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন। ত্রিপদী ছন্দে লিখিত উৎসর্গ-পত্র কবিতাটি এইরূপ—

"দিদি,
তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত সুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।"[৩০]

পত্রটির প্রথমাংশে পরিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন দিদি সৌদামিনী দেবী বেশ কিছুদিন (প্রায় এক বছর) প্রবাসে কাটিয়েছেন। আর সেই সূত্রে তিনি বিভিন্ন স্থল, জনপদ, নিসর্গ পরিভ্রমণ করেছেন। তাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অন্তরের ভ্রমণপিপাসু সত্তাটি। পরিতৃপ্তি লাভ করেছে বিপুল কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়-মানুষটি। তারই নিদর্শন স্বরূপ তিনি দুটি ভ্রমণ কথা লেখেন। যা পরবর্তীতে গুণে ও প্রসাদে ভ্রমণ সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। যার একটি 'ভিজিগাপত্তম' এবং অপরটি 'তীর্থদর্শন'। দুটি ভ্রমণকথাই 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

'ভিজিগাপত্তম' আসলে বিশাখাপত্তনম বা ভাইজাগ এর ভ্রমণকথাই রসাবিষ্ট। ট্রেনে করে সপরিবারে সৌদামিনী ভ্রমণ করেছেন। প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেছেন সবচেয়ে সুখের সাম্রাজ্যে। লেখিকার ভাষায়—

> "রেলের গাড়ীতে বসে প্রকৃতির শোভা দেখে দিনটা বেশ আরামে কেটে গেল। এই পাহাড় গাছ পালা—এই নদনদী তড়াগ; মুহুর্মুহু নবনব দৃশ্যের আবির্ভাব ও অন্তর্ধ্যান। প্রকৃতি দেবীর এইরকম লুকোচুরী খেলা দেখতে দেখতে অপরাহ্ন প্রায় চারিটার সময় আমরা গম্যস্থানে এসে পড়লেম।"[৩১]

এই ভ্রমণকাহিনী পাঠে জানা যায় ডাচরা সর্বপ্রথম এ দেশ জয় করে বসবাস করতে আরম্ভ করে। অতঃপর ইংরেজদের একাধিপত্য শুরু হয়। ডাচদের স্নানের দৃশ্য, মেমদের মিহিগলার চিৎকারে নিস্তব্ধ রাত্রির উল্লাস-কাঁপন প্রভৃতি দৃশ্যের কথা সৌদামিনী দেবী ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখিকা আরো বলেছেন হিন্দু তীর্থের সংখ্যা এখানে বেশি নেই, থাকার মধ্যে আছে রাজা নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তি। কোথাও দর্শন করেছেন "পীরের আস্তানা-রেলিং ঘেরা তিন চার হাত স্থান ধূপধূনা ও ফুলগন্ধে ভরপুর।।"[৩২]

ধর্মীয় স্থান ভক্তিভরে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা হারিয়ে গেছেন অনবদ্য, অনির্বচনীয় প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে। যে মায়ায় তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সৌন্দর্য আকণ্ঠ গলাধকরণ করতে থাকে : "উপরে মুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ—নীচে তরঙ্গায়িত সমুদ্র—বড়ই মনোরম স্থান।"[৩৩]

লেখিকার ভাষায় কোন এক ডাচ নাকি বাঙালিদের খাবার খাওয়ার জন্য বড়ই উৎসুক ছিলেন। একদিন তার সেই সকৌতূহল অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ হয়। তিনি মাংস, লুচি, মালপোয়া, পাঁপড় ইত্যাদি নানাবিধ খাবার পরিতৃপ্তির সহিত খেয়ে তারিফ করেন। ডাচদের একজন মেম অত্যন্ত ভালো মানুষ বনে যান লেখিকার নিকট। সৌদামিনীকে নাকি 'গ্র্যানী' সম্বোধনে ডাকতেন।

মোদ্দাকথা 'ভিজিগাপত্তম' ভ্রমণ কাহিনীর সারা দেহ জুড়ে আছে ভক্তির অনুসর্গ। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ মেলবন্ধন। এই দুই এ মিলেমিশে প্রবন্ধটি এক অত্যাশ্চর্য রূপ পায়। যা পাঠকবর্গকে এক অদ্ভুত অনালোকিত জগতের কথা শোনাতে ও দেখাতে সাহায্য করে। স্বয়ং লেখিকা এই অনির্বচনীয় প্রকৃতির সুধা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে শোকস্তব্ধ হয়েছেন তার উল্লেখ করতে পারি :

> "এখানকার সূর্য্য চন্দ্রোদয়ের দৃশ্য কি চমৎকার। মনে হয় সমুদ্রদেবতা যেন সূর্য্যচন্দ্রকে বক্ষের মধ্যে হতে বার করে হাত দিয়ে ধরে আকাশে উঠিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টির যতকিছু মহীয়সী মহিমায় বিশ্ব যেন তখন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠে। আমাদের বাড়ি যাওয়ার সময় প্রায় হয়ে এল, আনন্দই হচ্ছে, কেবল এই দৃশ্য থেকে আপনাকে ছিন্ন করতে একটা বেদনা অনুভব করছি।"[৩৪]

'তীর্থদর্শন'। সৌদামিনী দেবীর দ্বিতীয় ভ্রমণ প্রবন্ধ। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। এই ভ্রমণকাহিনী গড়ে উঠেছে মধুপুরকে কেন্দ্র করে। লেখিকা এবং আরো কয়েকজন গেছেন মধুপুরে তীর্থ দর্শন করতে। সময় শরৎকাল। শরতের মেঘ মুক্ত শুভ্র আকাশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাও লেখিকা এ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করেছেন। সৌদামিনী দেবী কবি নন। তিনি মূলত লেখিকা। অল্প বিস্তর লিখেছেন কিন্তু এই দুটি ভ্রমণ কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যাতে তাঁর কবি মনের সঙ্গে পাঠকবর্গ আলাপ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষেই নিসর্গ বর্ণনায় তিনি কবি হয়ে উঠেছেন এখানে। তার একছত্র উদ্ধৃত করা গেল—

> "শরৎকাল, বর্ষার পর শুভ্রস্বচ্ছ মেঘ, রাত্রে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলো, শেফালী ফুলে গাছতলা ছেয়ে গেছে, মধুর কণ্ঠে মন মাতিয়ে তুলেছে, প্রকৃতির শোভা দেখে যেন আর আশা মেটেনা।"[৩৫]

যাইহোক মধুপুর পৌঁছে লেখিকা সদলবলে কংসবাটি দর্শন করেছেন। দর্শন করেছেন কৃষ্ণ-বলরামকে। লেখিকার ভাষায় 'সব মূর্ত্তিই মাটির নির্ম্মিত।'[৩৬]

যমুনায় দেখেছেন কচ্ছপের ভিড়। মথুরার রাস্তায় ছোট ছোট বাছুর। পশু পক্ষী মানুষে এখানে ভীষণ সদ্ভাব। ষাঁড় গরুর পিরিত গলায় গলায়। বানরদের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা মোহিত হয়েছেন। পালে পালে হুপ হাপ করে তারা এ বাড়ি ও বাড়ি লাফিয়ে বেড়ায়। কারো কোন ক্ষতি করে না। খাবার পেলেই তাদের সন্তুষ্টি। ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে মেতে ওঠে। নৃত্য করে। মানুষ তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করে না।

মথুরা থেকে লেখিকা সদলবলে গেছেন বৃন্দাবন। তাঁর ভাষায় বৃন্দাবন মথুরার সন্নিকটেই অবস্থিত। বৃন্দাবনে তারা কতকগুলি মন্দির দর্শন করেছেন। মন্দির দর্শন করে যমুনায় স্নানের কথা ব্যক্ত করেছেন। তারপর আবার মন্দির দর্শন। সৌদামিনী বলেছেন বৃন্দাবনের নিধুবন এখন আর কুঞ্জবন নেই; বানরের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। আর আছে কতকগুলি বড় বড় গাছ, ফুল ফল নেই, শুকনো পচা পাতাতে বনভূমি আচ্ছন্ন।

আরেকটি মন্দির দর্শন করে রাধিকার মান আর কৃষ্ণের মান ভঞ্জনের দৃশ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন লেখিকা। দুটো পচা জলাশয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। যার একটি বিশাখা কুণ্ড ও অপরটি রাধিকা কুণ্ড। এই দুটি কুণ্ডের জন্ম-ইতিহাসও সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা তাঁর এই 'তীর্থদর্শন' প্রবন্ধে। হিন্দু ধর্মের প্রভাব যে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবলতর তার কথাও আমরা জানতে পারি এই প্রবন্ধ পাঠে। বৃন্দাবন, মথুরা দর্শন করে লেখিকা মুসলমানদের কীর্তি রাজ্য আগ্রা অভিমুখে গেছেন। তাজমহলের আশ্চর্য রূপ লেখিকাকেও মুগ্ধ করেছে। সেকেন্দ্রাবাদে আকবর বাদশাহের গোর দর্শন করেছেন। কেল্লা দর্শন করতে গিয়ে লেখিকা বিস্মিত হয়েছেন। কেল্লায় এসে দেখেছেন খাস দরবার, আমদরবার, বেগমদের স্নানের ঘর, শিশ মহল, মচ্ছিভবন ইত্যাদি। লেখিকার ভাষায়—

> "মচ্ছিভবনে বাদসা বেগমদের নিয়ে মাছ ধরতেন। সিসমহলে রঙ্গিন কাচ বসান তাতে আলো পড়লে চমৎকার দেখায়। লাল নীল আলোর আভাতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠে। উঠানে বড় বড় সব গোলাপ জলের ফোয়ারা রয়েছে তাতে বাদশারা স্নান করতেন;"[৩৭]

'তীর্থ দর্শন' প্রবন্ধে লেখিকা আরো অনেক ঐতিহাসিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। পাঠক প্রবন্ধ পাঠে ক্ষণিকের জন্যও ইতিহাসের সেই মেরুতে ফিরে যেতে পারবেন। আবেশে আবেগে এক ঐতিহাসিক রস সিঞ্চন করবেন। পরিশেষে বলতে হয় প্রবন্ধটিতে যেমন আছে নিসর্গের অনবদ্য ব্যাখ্যা তেমনি আছে ইতিহাস চেতনা; আকবর, বাদশার বিলাসিতার অনুষঙ্গ। যেমন আছে মন্দির দর্শনের চিত্রকল্প তেমনি আছে লেখিকা সৌদামিনী দেবীর অকৃত্রিম সোহাগ-আদর-ভালোবাসা। সবমিলে 'তীর্থদর্শন' ভ্রমণ প্রবন্ধটি সমগ্র পাঠক শ্রোতৃবর্গের নিকট বড়ই সমাদৃত। অজস্র রূপ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে তা ব্যতিক্রমী ও অভিনবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ওঠে।

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় সৌদামিনী দেবী সাহিত্যচর্চায় বিস্তৃত পথ অতিক্রম করতে না পারলেও মহিলাদের রচিত বাংলা সাহিত্যের ধারায় তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'পিতৃস্মৃতি' অনন্য সাধারণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। যার সাহিত্য-তাৎপর্য আর পাঁচটি মূল্যবান গ্রন্থের মতোই সমপর্যায়ভুক্ত। 'ভিজিগাপত্তম' ও 'তীর্থ দর্শন'—দুটি ভ্রমণ কথার সুনিপুণ বিশ্লেষণে তিনি পাঠক চিত্তে অনুপম নিসর্গ বোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসের বাতাবরণে ঐতিহাসিক রসের মধ্যে দিয়ে পাঠক কখনো মুঘল যুগে পৌঁছে গেছেন আবার কখন ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়েছেন। কখনো কখনো তাঁর বিশ্লেষণী চেতনা এতটা তীক্ষ্ণ হয়েছে, তার সঙ্গে শব্দ, ছন্দ ও ব্যঞ্জনার যথার্থ মেলবন্ধনে পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে সৌদামিনীর কবিত্ব। তিনি হয়ে উঠেছেন কবি। ব্রহ্মসংগীতের সুরে তিনি ভরিয়ে তুলেছেন সমগ্র সংগীত প্রেমীর হৃদয়। সৌদামিনীই প্রথম যিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে শিক্ষার জন্য বহির্বাটি হলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনে সক্ষম হলেন। যে পথ ধরে অন্যান্যরা বেরিয়ে এলেন শিক্ষা গ্রহণে। যাঁর জীবনের সিংহভাগই কেটে গেছে ঠাকুরবাড়ির অন্তপুরে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে, তাঁর থেকে আমরা কতটা আশা করতে পারি! তথাপি তিনি যেটুকু সাহিত্য চর্চা করেছেন তা প্রসাদ গুণে গুণান্বিত।

উৎস নির্দেশ

১. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ. ৭।

২. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২১, কল-২৬, পৃ. ১৩।
৩. যোগেশচন্দ্র বাগল (সংযোজন, টীকা ও সম্পাদনা), সুতপা ভট্টাচার্য (নতুন সংস্করণের ভূমিকা), সরলাদেবী চৌধুরানী - জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ২০০৯, পৃ. ১৮৮।
৪. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ. ১৬।
৫. যোগেশচন্দ্র বাগল (সংযোজন, টীকা ও সম্পাদনা), সুতপা ভট্টাচার্য (নতুন সংস্করণের ভূমিকা), সরলাদেবী চৌধুরানী - জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ২০০৯, পৃ. ১৮৮।
৬. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ.
৭. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২১, কল-২৬, পৃ. ১৪।
৮. তদেব, পৃ. ১৪।
৯. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ. ১৩।
১০. তদেব, পৃ. ৩৩।
১১. তদেব, পৃ. ৩৩।
১২. তদেব, পৃ. ১৯।
১৩. তদেব, পৃ. ৩১।
১৪. তদেব, পৃ. ৩২।
১৫. তদেব, পৃ. ৩১।
১৬. তদেব, পৃ. ১৪।
১৭. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, কল-০৪, পৃ. ১৯।
১৮. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ. ১৪।
১৯. তদেব, পৃ. ১৭।
২০. তদেব, পৃ. ১৯।
২১. তদেব, পৃ. ২২।
২২. তদেব, পৃ. ৫৫।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৬।
২৪. তদেব, পৃ. ৫৭।

২৫. তদেব, পৃ. ৮।

২৬. তদেব, পৃ. ৬২।

২৭. তদেব, পৃ. ৬৩।

২৮. তদেব, পৃ. ৪৪।

২৯. বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, সৌদামিনী দেবী : ঠাকুরবাড়ির অসামান্যা নারী, গৌড় খাঁড়া (সম্পাদিত), পান্থজন - ঠাকুরবাড়ির নারীশক্তি ও বঙ্গসংস্কৃতি, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানু-মার্চ, ২০২৩, পৃ. ৫০-৫১।

৩০. সুতপা ভট্টাচার্য (ভূমিকা ও টীকা), সুতপা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ সেন (সংকলন ও সম্পাদনা), সৌদামিনী দেবী - পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৩২, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি-২০১৭, পৃ. ৮।

৩১. তদেব, পৃ. ৪৫।

৩২. তদেব, পৃ. ৪৬।

৩৩. তদেব, পৃ. ৪৬।

৩৪. তদেব, পৃ. ৪৭।

৩৫. তদেব, পৃ. ৪৮।

৩৬. তদেব, পৃ. ৪৯।

৩৭. তদেব, পৃ. ৫২।

অশোক বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

শরৎ উপন্যাসের নাট্যায়ন

অমলচন্দ্র সরকার

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে মঞ্চস্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্র নাট্যকার ছিলেন না; কিন্তু তাঁর উপন্যাসের কাহিনূ নাট্যমঞ্চের কলাকুশীলবদের বারে বারে আকর্ষণ করেছে। বিজয় যে জনপ্রিয় একটি নাটকের মর্যাদা আদায় করতে পেরেছিল, তা তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত দর্শকদের নিরপেক্ষ বক্তব্য থেকেই জানা যায়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, 'বইখানি শরৎচন্দ্রের রচিত সর্বজন আদৃত উপন্যাস, তার উপর শিশিরকুমারের নিপুণ হাতে নাটকাকারে গ্রথিত।' গৃহস্থ দম্পতির দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মঞ্চে রূপায়িত করতে শিশিরকুমারের প্রয়াস ও সাফল্য লক্ষ্য করার মতো। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী ও উপস্থাপনা নাট্যগুণে সমৃদ্ধ বলে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা তাঁর উপন্যাসগুলির মঞ্চায়নেই প্রমাণ হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কেন মঞ্চায়নের অনুকূলে এবং কেন তার নাট্যরূপ দর্শককে আকৃষ্ট করেছে তা তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূচক শব্দ : প্রয়াস, কাহিনী, নাট্যরূপ, বিশ্লেষণ, সাবধানতা, নাট্যরীতি, অভিনেত্রী, ঋণ, নিজস্ব, মঞ্চ।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-নির্মাণে এলোমেলো এবং অসতর্ক ছিলেন, একথা মোটেই বলা চলে না। তিনি নিজস্ব ধ্যানধারণা-অনুযায়ী একটা আঙ্গিকঘটিত মডেল আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো ডাকসাইটে পূর্বসূরীদের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিলেন। ঐ দুজন ঔপন্যাসিক যে কী পরিমাণে রীতি-সচেতন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্র তা জানেন। অন্তত আঙ্গিক বিষয়ে শরৎচন্দ্র এঁদের দুজনের কাছ থেকে বুঝে সুঝে ঋণ নিয়েছেন এবং তাকে নিজের মতো করে বদলে একটা বিশেষ ঢঙে দাঁড় করিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে রোমান্স রচনার প্রাথমিক দুটি চেষ্টায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতিতে, অথবা তৃতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎদৃপ্ত রম্যতায় সর্বত্র বঙ্কিম-প্রবর্তিত নাট্যধর্মী আঙ্গিককে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও উপন্যাসের আগ্রাসী শক্তি ও স্বাধীনতার দ্বারা নাটকীয় রীতির সীমাবদ্ধতাকে তিনি ভেঙেও নিয়েছিলেন এবং বিচিত্র অভ্যন্তর কারিগরির সাহায্য তাকে জটিল ও মনোরম করে তুলেছিল। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তাঁর প্রধান দান নাট্যরীতির স্বীয়করণ। মনোজগতের গভীর বিক্ষোভ বা কূট বিশ্লেষণও নাটকীয়তা আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসে নাট্যভঙ্গি বলতে যে বহিরঙ্গ ঘটনামূলকতা ও রোমাঞ্চকর চমৎকারিত্ব মাত্র বোঝায় শরৎচন্দ্র সে ধারণার মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। অপর পক্ষে নাট্যবৃত্তের নিটোলতার ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি শাখায়িত কাহিনী বিস্তারের পথ ধরলেন।

সরকার, অমলচন্দ্র : শরৎ উপন্যাসের নাট্যায়ন
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 21, No. 2, December 2024, Pages : 18-24, ISSN 2249-4332

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের নাট্যবিরোধিতাকে পছন্দ করেননি। 'দত্তা'র বিজয়াকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নাট্যরূপের সময় নামকরণ 'বিজয়া' দেওয়া হয়।

'দত্তা'র যে নাট্যরূপ দেওয়া হয় তাতে শরৎচন্দ্র পাঁচটি অঙ্ক এবং ষোলটি দৃশ্যে বিভক্ত করে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম অংকে ৩টি, দ্বিতীয় অংকে ৫টি, তৃতীয় অঙ্কে ৩টি, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ২টি দৃশ্য সংযোজন করে 'দত্তা'কে যথার্থই মঞ্চ উপযোগী নাটক করে তুলতে সক্ষম হন। বলাই বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছাড়া নাট্যকার প্রতিভাও ছিল, 'দত্তা'র নাট্যরূপেই তা প্রমাণিত হয়েছে। নাটকটির মঞ্চ সফলতা নিয়ে সেকালের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেও আলোচনা হয়েছে। বিজয়া নাটকখানি শরৎচন্দ্রের দত্তার নাট্যরূপ এবং শরৎচন্দ্র স্বয়ং এর রূপ দিয়েছেন। "সেদিন রাত্রে বিজয়ার যে অভিনয় আমরা দেখিয়াছি সেইরূপ প্রাণবন্ত অভিনয় বহুদিন আমরা দেখি নাই।"[১] শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। এইরূপ একটি পরিচিত আখ্যানভাগকে চোখের সামনে মূর্ত করে তুলতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন। গল্পরসের নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। ফলে বঙ্কিমী আঙ্গিকের দিকে তাঁকে ফিরতে হয়েছে, যে আঙ্গিক গল্পকে খর্ব করেনি, বরং আরও আকর্ষণীয় করেছে এবং যুগপৎ অন্তর্মুখী গভীরতা দিয়েছে। যদিও বঙ্কিমের বর্ণাঢ্যতা, কল্পনালোকে অবাধ বিহার, ভেতরের প্যাশন-তীব্রতার প্রতিরূপ হিসেবে শেক্সপিয়রীয় নাট্যরীতির আত্মীকরণ শরৎচন্দ্রের কাছে অপরিচিত দুনিয়া, তবুও নাট্যিক রীতিতে বিবৃত গল্প সাধারণ পাঠকের মনে যে ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে অন্য রীতিতে তা সম্ভব নয় ভেবে শরৎচন্দ্র আবার পুরাতন বঙ্কিমী ঢঙে ফিরে যেতে চেয়েছেন। "ভাব ও আদর্শের মহিমার ফলে তৎকালীন নাটক বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে।"[২]

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নাট্যিক রীতির চেষ্টার সঙ্গে কাহিনীর আবেদনও কোনো অংশে কম নয়। তাঁর এই চমকপ্রদ কাহিনীর সঙ্গে সমাপ্তিতে যে নাটকীয়তার চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা আছে, তা তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। বলাই বাহুল্য একান্ত আড়ম্বরহীন সমাপ্তি তাঁর উপন্যাসে বিরল। 'বিরাজ বৌ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ার পর শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র নাট্যরূপ দিলেন 'বিজয়া' নামে।

> "শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' একটি সফল মিলনান্তক উপন্যাস। 'বিজয়া' নাটকের নায়িকা হলো 'বিজয়া'। বিজয়া আধুনিকা, বিদূষী ও সুন্দরী। তার চিন্তা ও কথা বলার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত ভাব রয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃবন্ধু রাসবিহারীর তত্ত্বাবধানে সে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং গ্রামের জমিদারী ও পৈতৃক বাড়ি ঘরদোর দেখাশোনার জন্যে বিজয়া গ্রামে এসেছে। সেখানে রাসবিহারীও আছে, যে তার অভিভাবক এবং যার মনের একান্ত ইচ্ছে যে, সে তার সুযোগ্য পুত্র বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ দেয়। বিজয়ার মতো পাত্রীকে লাভ করতে পারবে ভেবে বিলাস মদগর্বে গর্বিত ও উদ্ধত। এক অমিতশালী প্রভুত্ব ও বীর্য তার চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সেই প্রভুত্ব খাটাতে চায় বিজয়ার ওপর। নিজের আহরিত সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করার এক তীব্র অভীপ্সা তার মধ্যে জেগে ওঠে।"[৩]

এই ভোগ প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘাত লাগে বিজয়ার সহজাত প্রেয়সী চেতনার। আর এই চেতনাবোধই বিজয়াকে বিদ্রোহিনী করে তোলে। বিজয়া স্বাধীনচেতা নারী। স্বভাবে ও কর্মে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। বিজয়ার প্রেমকেই বৃহৎ করে দেখানো হয়েছে। বিজয়ার প্রেমে কোনো পরিপাক নেই, সাধনা নেই, suffering নেই। নরেনকে দেখার পরেই তার প্রেম জাগ্রত হয়েছে। নরেনকে কাছে পেতে তাকে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনও করতে হয়নি; বিলাসকে ত্যাগ করতে তাকে

বেশি সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি। 'দত্তা'র যবনিকায় লেখক ঘোষণা করছেন লেখক 'মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ'।

সমগ্র নাটকখানি দেখে কোনরূপ বিরক্তি মনকে পীড়িত করে না। সর্বাপেক্ষা সুন্দর অভিনয় করেছেন বিজয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতী। প্রাণের অনুভূতি এবং দরদ দিয়ে তিনি যে বিজয়ার চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, তার তুলনা হয় না। বিজয়া নাটকে অভিনয় করে তিনি রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসন অধিকার করেছেন, 'দত্তা'য় বিজয়াকে তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে মূর্ত করেছেন। নরেনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় যে এত সুন্দর হবে তা কল্পনাতীত। রাসবিহারীর ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় এবং রূপসজ্জা খুব সুন্দর হয়েছে। বিলাসবিহারীর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছে। গ্রাম্য বালক আধপাগলা পরেশের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছে সে তার অতি স্বাভাবিক অভিনয় সমস্ত দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল। নলিনীর ভূমিকায় রানীবালার অভিনয় খুবই প্রসংশার যোগ্য। "তবে বিজয়ার পার্শ্বে তাহা দাঁড়াইতে পারে না।"[৪]

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া' যে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে তা তৎকালীন পত্র-পত্রিকার প্রশংসিত মন্তব্য থেকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি সমকালীন বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিমণ্ডলীর মতামত এ প্রসঙ্গের সমর্থনের পক্ষেই গেছে। 'বিজয়া' নিয়ে কোনো বিরূপ সমালোচনা শিশিরবাবুদের শুনতে হয়নি। বরং প্রশস্তি ও প্রশংসাতেই 'বিজয়া'র জনপ্রিয়তার দিকটি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করেছে। 'বিজয়া'র সাফল্যের পর শরৎচন্দ্রের আরো দুটি উপন্যাস রঙ্গমঞ্চে জায়গা করে নেয়। একটি 'নববিধান' এবং অপরটি শরৎচন্দ্রের বহু আলোচিত উপন্যাস 'গৃহদাহ'। নবনাট্য মন্দিরে শরৎচন্দ্রের শেষ যে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল তা হল 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'অচলা' নামে। ২২ অক্টোবর ১৯৩৬-এ নবনাট্য মন্দির 'অচলা' অভিনীত হলে সংবাদপত্রে লেখা হয়—

> "A mighty attempt at unraveling threat by thread of the twisted psychology of the modern maid that reveals itself in Bengal of today on a background of the placid and self satisfied conservation which has lest neither its aggressiveness nor its grip over the quidrunces of the society."[৫]

কেবল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেই নয়, 'দেশ' পত্রিকাতেও 'অচলা'র অভিনয় নিয়ে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'দেশ'-এ লেখা হয়,

> "অচলা নাটকের কথা লিখিতে বসিলেই আমাদের গৃহদাহ চিত্রের কথা স্বভাবতই মনে আসে। টেকনিকের দিক দিয়া গৃহদাহ চিত্র অতুলনীয় হইলেও অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রাণের যোগ না থাকায় তাহা দর্শকদিগের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ছবি দেখার পর অচলার অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অচলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে সেদিন কেবল এই কথাই মনে হইতেছিল যে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার এখনও অদ্বিতীয়।"[৬]

অন্যান্য উপন্যাসের নাট্যরূপ যেভাবে রঙ্গমঞ্চে সাফল্য অর্জন করে, 'অচলা' নবনাট্য মন্দিরে সেভাবে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। 'অচলা'র নাট্যরূপ যথার্থ হয়নি। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র শিশির ভাদুড়ীকৃত নাট্যরূপায়নে খুশি হতে পারেননি। তিনি নাকি 'অচলা'র নাট্যরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন- 'শিশির আমার 'অচলা'র আকারটা লোপ করে দিয়েছে।' দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই তিন-চার রজনী অভিনয়ের পরেই 'অচলা'র অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় নবনাট্য মন্দির কর্তৃপক্ষ। সে সময়ে 'গৃহদাহ'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং

শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

চার অংকে বিভক্ত নাটকটিতে মোট দৃশ্য বিন্যস্ত করা হয় সতেরটি। প্রথম অংকে একটি, দ্বিতীয় অংকে চারটি, তৃতীয় ও চতুর্থ অংকে ছয়টি করে দৃশ্য রচনা করে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'অচলা' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের একটি তত্ত্ববহ লেখা যে অভিনয়যোগ্য করে উপস্থাপিত করা কঠিন বিষয়, সেটি অচলার অভিনয় ও নাট্য রূপান্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করা যায় যথার্থই। 'গৃহদাহ'-এর তত্ত্বকথা শিশিরের কলমে তেমন প্রকাশ পায়নি বলেই রঙ্গমঞ্চে তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়ে ওঠেনি। "স্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যত্যয় সামাজিক রীতিনিয়মের লঙ্ঘন যেখানেই ঘটেছে সেখানেই তিনি খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেছেন।"[৭]

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে যে সমালোচনা ও বিতর্ক লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হল 'দেনাপাওনা' উপন্যাস। 'দেনাপাওনা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩-এ। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র- ষোড়শী ও জীবানন্দ। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের ষোড়শী চণ্ডীগড়ের চণ্ডী ঠাকুরের ভৈরবী। এই ভৈরবীর জীবন রসবোধ-এর পশ্চাতে রয়েছে একটি রহস্যময় নেপথ্য ইতিবৃত্ত। সে ইতিবৃত্ত বেশ করুণ ও রহস্যময়। বীজ গাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তরুণ বয়সে ষোড়শীর মা কাজের জন্যে যে হোটেলে থাকতো, সেই হোটেলেই ষোড়শীর সঙ্গে প্রথম দেখা। ষোড়শীর বয়স ন-দশ বছর হবে। সে সময়ে জীবানন্দ ষোড়শীর মায়ের কাছ থেকে একশ টাকা ঋণ নেয়। জীবানন্দ সে ঋণ শোধ করতে না পারায় ষোড়শীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। বিয়ে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে বিয়ের ফল হয়েছিল অন্যরকম। বিয়ের পরই জীবানন্দ উধাও হয়ে যায়। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে চণ্ডীগড়েই ষোড়শী ও জীবানন্দের সঙ্গে দেখা। জীবানন্দ একদিন যে অলকাকে বিয়ে করেছিল, সে আজ অলকা নয়, সে ষোড়শী। চণ্ডীগড়ের ভৈরবী নামে পরিচিতা। এই সুদীর্ঘ বারো-তেরো বছর ব্যবধানের পর এই সাক্ষাৎকারই 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সূচনা। অলকার ষোড়শী পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নেই। ভৈরবীর দশ মহাবিদ্যার নাম ছাড়া কোনো নাম তার আজ আর নেই। কিন্তু জীবানন্দ ষোড়শীকে নয়, তার সেই অতীতের অলকাকেই চায়। আর এ পটভূমিকাতেই উপন্যাসের কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। "নাটকটি শেষে কিছুটা মেলোড্রামাক্রান্ত হয়েছে"[৮] শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র প্রথম নাট্যরূপটি ১৯২৭-এর ৬ই আগস্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। এর আগেই 'বিরাজ বৌ' মঞ্চস্থ হলেও 'দেনাপাওনা' শরৎচন্দ্র এবং নিজের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে, নিজের নাট্যপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত দিকটি তেমন ভাবে প্রকাশ ঘটাতে না পারলেও, তবুও তাঁর এই প্রচেষ্টা শরৎজীবনের একটি অংশবিশেষ হয়ে উঠতে পারায় কম গৌরবের নয়। 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে একটি বিশেষ বিতর্কিত অধ্যায় হয়ে আছে। 'দেনাপাওনা' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটি শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের প্রথম নাট্যরূপ দেন শিবরাম চক্রবর্তী। তিনিই নামকরণ করেন 'ষোড়শী'। শিবরাম চক্রবর্তী এটির নাট্যরূপ দেওয়ার পর তিনি শিশিরবাবুর কাছে নিয়ে গেলে, শিশিরবাবু এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখাননি। অগত্যা নাট্যরূপটি নিয়ে তিনি ভারতী সম্পাদিকা সরলাদেবীর কাছে যান। কিন্তু লেখাটির প্রকাশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা 'ভারতী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

দেনাপাওনার নাট্যরূপ নিয়ে সে সময়ে শরৎচন্দ্র ও ভারতী কর্তৃপক্ষের নাটকে শিবরাম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতেও দ্বিধা

করেননি—'শরৎ চাটুজ্যে বহুকাল মাথা ন্যাড়া করে বসে থেকেও সে বেল তাঁর মাথায় পড়ল না।' ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্র পেয়ে শরৎচন্দ্রের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাই ২৬ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর ষোড়শী সম্পর্কে নিজস্ব বোধ ব্যক্ত করে নাটক ও উপন্যাসের উপস্থাপনা রীতি সম্পর্কে আলোকপাতসহ 'ষোড়শী' সম্পর্কেও লিখে জানান—

> "আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু-একটা লেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টডসাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।"[৯]

'ষোড়শী' নাটক নিয়ে সেকালে বিতর্ক না হলেও উত্তরকালে শিবরাম চক্রবর্তী এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখায় আলোকপাত করেছেন। বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে একটি সমালোচনাও হয়েছে। দেনাপাওনার নাট্যরূপ হিসেবে 'ষোড়শী' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে কতখানি সাফল্য ও অসাফল্য লাভ করে সেই প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচনায় অবশ্যই এসে যায়।

যদিও শরৎচন্দ্র উপন্যাসের সঙ্গে নাট্যরূপের 'বিষাদান্তক' পরিণতিকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন নাট্য প্রযোজকের নাট্য সম্পাদনার স্বাধীনতাকে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যা কেবল রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নয়, 'ষোড়শী'র প্রযোজনা শিশিরকুমারের জীবনের একটি স্মরণীয় কীর্তি বলা যায়—একটি mile stone।[১০] 'ষোড়শী' বহুবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। শিশিরকুমারের ষোড়শী বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। শ্রীরঙ্গম পর্বে যখনই তিনি নতুন নাটকের অভাববোধ করেছেন তখনই পুরনো নাটকের অভিনয় করেছেন। এই পুরনো নাটকের মধ্যে ষোড়শী অন্যতম। কেননা ষোড়শীর জীবানন্দ শিশিরকুমারের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। আমাদের মনে হয় শিশিরকুমারের অভিনয় জীবনে জীবানন্দ এবং শিশিরকুমার যেন সমার্থক। নাটকের মুখ্য চরিত্র তথা প্রধান চরিত্র জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী বোদ্ধা মানুষের প্রতিক্রিয়া জানা গেছে।

'নবযুগ পত্রিকা'তেও লেখা হয় ষোড়শীর ঘটনা কিছুমাত্র জমকালো নয়, তার মধ্যে কোন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নেই, তার মধ্যে বেশভূষার জাঁকজমক নেই, দৃশ্যপটের আস্ফালন আদৌ নেই, লাঠি ও রিভলবার দেখা যায় বটে কিন্তু সেগুলোও বাঙালীর বক্তৃতার মত দেখতেই উজ্জ্বল অর্থাৎ তাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা নেই, ঘন ঘন আর্টিস্টিক Pose লওয়া নেই অভিনেতাদের মুখে চোখে পুনঃ পুনঃ Lime Light ফেলে দর্শকদের ভড়কে দেবার মত কোন চেষ্টা নেই অথচ ষোড়শীর অভিনয় যে জমেছিল গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করে রেখেছিল বেদনার রসে তাদের হৃদয় পেয়ালা যে কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল তা প্রায় সবাকার নয়ন কোণে দু-চার ফোঁটা জল এসে প্রমাণ করে দিয়েছিল। ষোড়শী বাংলার পল্লীর নিপুণভাবে অঙ্কিত চিত্র। অথচ এর কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন নেই, আগাগোড়াই সহজ সত্য ও অনাড়ম্বর। অভিনয়েও এই সরলতার স্বচ্ছন্দ সর্বত্র অব্যাহত রাখা হয়েছে।

'দেনাপাওনা' উপন্যাস হিসাবে যেমন জনপ্রিয় তেমনি এর নাট্যরূপ, অভিনয়নৈপুণ্য স্মরণীয় হলেও দর্শক

মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই মাত্র পনের রজনীর পর আর চলেনি। থিয়েটারে দর্শকের অভাব হলে অভিনয় আর চলেই বা কিভাবে? সেজন্য শিশিরকুমার কোনোরকম ভাবনা চিন্তা না করেই অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দর্শক টানতে ব্যর্থ হলেও ষোড়শীর প্রযোজনা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি দিগদর্শনীর ভূমিকা পালন করে গেছে এবং শিশিরকুমারের জীবানন্দের ভূমিকায় বহুকালই নয়, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেও তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'ষোড়শী'র পর শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'কে নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন নাটক রচনাতেও তিনি সমান পারঙ্গম। শরৎচন্দ্র এর আগে কখনও স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করেননি। অর্থাৎ মৌলিক নাটক রচনার প্রতিভা বলতে যা বোঝায় শরৎচন্দ্রের তা ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাট্যরূপটি তার প্রমাণ বহন করে। শরৎবাবু 'রমা' রচনা করেছিলেন আর্ট থিয়েটারের জন্য।

উপন্যাস হিসাবে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটির সাহিত্যগুণ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। গ্রামসমাজের বাস্তব চিত্রকেই চিত্রায়িত করা হয়েছে। গ্রামভিত্তিক পল্লীসমাজ গল্পটিকে ঘিরে আছে অন্ধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা। পল্লীবাংলার এমনই এক ঘন পঙ্কিল সমাজে রমা একটি শুভ্র পদ্ম। প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও রমা সমাজের কঠোর অনুশাসনকে ভাঙতে পারেনি। কিন্তু রমেশকে রমা অস্বীকার করতে পারেনি। এখানে আছে রমার প্রণয়ের সাধনবেগ। সমাজের অনুশাসনের আবর্তে রমা তিল তিল করে দগ্ধ হয়েছে জ্বালায় যন্ত্রণায় সে তার দেহ ও মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আবার বৈধব্যজীবনের চরম পরাকাষ্ঠার মধ্যে রমা পারেনি অসংযত হতে। সব মিলিয়ে শরৎচন্দ্র রমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে 'প্রেম যে শুধুমাত্র দুগ্ধ শুভ্র ফেন নিভ শয্যায় স্থায়ী না হয়ে কর্তব্যের মধ্যে আলোকিত হয়ে ওঠে।'—একথাও প্রচার করতে চেয়েছিলেন উপন্যাসে। কিন্তু 'রমা'র নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে কেন যে ব্যর্থ হল, সে প্রসঙ্গে আর্ট থিয়েটারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করতে হয়। এ নাট্যরূপটি শিশিরকুমারের ব্যবস্থাপনায় হলে হয়তো 'রমার' এমন বিপর্যয় ঘটতো না। এছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। শিশিরবাবু নিজে অভিনয়ের প্রয়োজনে রদ-বদল করতেন সম্পাদনা করতেন, অভিনয় উপযোগী করে তুলতে হলে নাট্যপরিচালককে যে কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হয় শরৎবাবু তা দিতে চাইতেন না। শিশিরবাবু নিজেই বলেছেন'লেখা একলাইনও উনি (শরৎচন্দ্র) কাটতে দিতেন না।' শেষপর্যন্ত আর্ট থিয়েটারে তীব্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শরৎবাবু 'রমা' নাট্যরূপটি শিশির ভাদুড়ীর হাতে সঁপে দেন। শিশিরকুমার ১৯২৯ সালে আগস্টে কর্ণওয়ালিশ নাট্যমন্দিরে 'রমা' নতুন করে প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়ে 'পল্লীসমাজ' রমার নাট্যরূপে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১. দেশ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭২।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১২৯।
৩. রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৯০।
৪. বাংলা মঞ্চে শরৎ সাহিত্যের প্রযোজনায় শিশিরকুমার ও জগন্নাথ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭০০০৭৩ পৃ. ৩১।
৫. তদেব, পৃ. ৩২।

৬. তদেব, পৃ. ৩২।
৭. বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, অশোককুমার মিশ্র, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৪০।
৮. শচীন সেনগুপ্তের নাট্যভাবনা ও সমাজ চিন্তা, ড. শম্পা ভট্টাচার্য, সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১০৪।
৯. নিজেরে হারায়ে খুঁজি পত্রিকা, ২য় পর্ব ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫০।
১০. নবযুগ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

অমলচন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, নদিয়া

বিভূতিভূষণ ও নারী-নিসর্গবাদ : নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা

পূজা ভুঁঞে

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে আমরা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বসবাস করছি। সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের জীবনে কৃত্তিমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'উন্নয়ন' যেকোনো দেশের সমাজ ও জাতির জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মানস সভ্যতার সার্বিক উন্নয়নের নামে আমরা প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছি। এর শুরুটা হয়েছে বহু পূর্বেই, এখন আমরা ধ্বংসের মুখে। তাই বর্তমানে সমালোচনা সাহিত্যধারার 'ইকো-ক্রিটিসিজম' বা পরিবেশ সমালোচনা একটি বহুল চর্চিত বিষয়, যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭২ সাল নাগাদ। পরিবেশবাদ (Ecocriticism) ও নারীবাদকে (Feminism) একত্রিত করে নারী-নিসর্গবাদ (Eco-feminism) ধারণার উৎপত্তি হয়। মূলত নারীবাদের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে পরিগণিত হয় 'পরিবেশগত নারীবাদ'। এই আন্দোলনকারীদের বলা হয়ে থাকে নারী নিসর্গনীতিবাদী বা 'ইকোফেমিনিস্ট'। প্রকৃতি ও নারীর মধ্যেকার সাদৃশ্যকে সামনে রেখে এই মতবাদের উৎপত্তি। প্রকৃতি ও নারীর অভিন্ন সত্তার বার্তা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। তবে আধুনিক সময়ে এসে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিরসবুজ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি সচেতনার বার্তার কথা তাঁর শুরুর দিকের সাহিত্য থেকেই পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে এসে এই বার্তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে 'আরণ্যক' একটি প্রকৃতি সচেতনতা মূলক উপন্যাস। নিজ জীবনের প্রতিচ্ছবি সত্যচরণকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার অশনি-সংকেত দিয়েছেন এই উপন্যাসে। সেইসঙ্গে নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার চিরন্তন সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছু নারী চরিত্রের অবতারণা করেছেন, যারা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছে প্রকৃতিকন্যা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' উপন্যাস অবলম্বনে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্কবার্তা অনুসন্ধানের প্রয়াস উক্ত গবেষণা পত্রের মূল লক্ষ্য।

সূচক শব্দ

ইকো-ফেমিনিজম, ঈশ্বরী, নদী, নারী, প্রকৃতি, পুরুষতন্ত্র, বিশ্ব-উষ্ণায়ন, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, সমাজ।

মূল আলোচনা

নারী-পুরুষ পরস্পর বিপরীত গুণসম্পন্ন। পুরুষ কঠোরতা আর নারী কোমলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। নারীবাদ লিঙ্গ নিরপেক্ষ অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ই 'মানুষ' (Human) পরিচয়ে বিশ্বাসী। 'ইকো-ফেমিনিজম্' ধারণায় নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কীভাবে নারী ও প্রকৃতি উভয়ের সঙ্গে সামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, সেই ভাবনাই প্রকাশ করে এই তত্ত্ব। এই মতবাদ মনে করে নারী ও প্রকৃতির উপর 'মানুষ' আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এখানে 'মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে 'পুরুষতন্ত্রে'র কথা। এই কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ

ভুঁঞে, পূজা : বিভূতিভূষণ ও নারী-নিসর্গবাদ : নির্বাচিত পাঠ অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 21, No. 2, December 2024, Pages : 25-32, ISSN 2249-4332

'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১) গল্পে 'মেয়ে মানুষ' কথাটির ব্যবহার করেছিলেন অন্তত বার দশেক।

নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয় নারী দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোলন। ১৭৩০ সালে রাজস্থানের যোধপুরে অমৃতা দেবার নেতৃত্বে ৩৬৩ জন বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের সদস্য নিয়ে বৃক্ষ আন্দোলন হয়েছিল। এইরকমই 'চিপকো আন্দোলন' (১৯৭৪) হল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে বন-সংরক্ষণ আন্দোলন। এছাড়া সুগাথা কুমারীর নেতৃত্বে 'সাইলেন্ট ভ্যালি' আন্দোলন ও ১৯৮৪ সালে বন্দনা শিবার নেতৃত্বে 'নবদান্যা' প্রভৃতি আন্দোলনগুলি নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্ককেই ইঙ্গিত করে।

'পরিবেশগত নারীবাদ' অথবা নারী-নিসর্গবাদ কথাটি পাশ্চাত্য প্রভাবিত হলেও ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে ভাবনাটি অভিনব নয়। অর্থাৎ ইকো-ফেমিনিজমের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। বরং নারী ও প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে ভারতীয় সংস্কৃতি চিরকাল স্বীকার করে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের শুরুর দিক থেকেই নারী নৈসর্গ ভাবনার ছাপ রয়েছে। প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণের সীতা যেমন প্রকৃতিকন্যা; অথবা কালিদাসের শকুন্তলা কেবল প্রকৃতি কন্যাই নয়, জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে তার আত্মিক যোগ লক্ষণীয়। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এর 'মহুয়া পালা'য় মহুয়া চরিত্রটি হয়ে উঠেছে চিরন্তন সজীবতার প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসের কপালকুণ্ডলাও তেমনি এক চরিত্র, যাকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। আবার আধুনিক সময়ে এসে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন' (১৮৮৮) কাব্য দুটিতে প্রকৃতি দেবীর আরাধনাই করা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে 'ইকো-ফেমিনিজম্' ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। তিনি 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতির সংযোগকে নির্দেশ করে বলেছেন—"শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়।"[১] আবার তিনি 'ছিন্নপত্র' এর '৪৩ সংখ্যক' পত্রে নারী ও জলকে অভিন্ন সত্তা হিসেবে দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে অকৃত্রিম বালিকা চরিত্র 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকে সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথই। এর পর বাংলা সাহিত্যে সবুজতার বিপ্লব নিয়ে পদার্পণ করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁচরাপাড়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই পাঠকের মানস কল্পনায় ভেসে ওঠে সবুজতার প্রতিচ্ছবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ঘটে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রমরমা ও বাঙালি ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজ প্রভাব যখন চরম পর্যায়ে তখন বিভূতিভূষণ তুলে ধরলেন বঙ্গদেশের শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল রূপ। অতঃপর তাঁর লেখনীতে প্রকৃতিও জীবন্ত চরিত্র হয়ে ধরা দিল। শুধু প্রকৃতি চেতনাই নয়, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে চিরন্তর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে দেখালেন তারা বস্তুতই একে অন্যের পরিপূরক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। বলাবাহুল্য যে বাঙালির গৃহে একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রয়েছে সেই ঘরে অবশ্যই একটি 'পথের পাঁচালী' রয়েছে। দার্শনিক বিভূতিভূষণ নারী ও নিসর্গকে অকপটে স্বীকার করে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে প্রকৃতিকন্যা দুর্গা ও ইন্দির ঠাকরুনকে তুলে ধরলেন।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্রের সংখ্যা তিন, যথা—ইন্দির ঠাক্‌রুন, সর্বজয়া ও দুর্গা। একজন বৃদ্ধা, আর একজন প্রৌঢ়া ও অন্যজন কিশোরী। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় ছয় বছরের দুর্গা ও পঁচাত্তর বছরের ইন্দির ঠাক্‌রুনকে পাকা বীচকলা খেতে। দুজনের বয়সের পার্থক্য বিস্তর হলেও উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজে বিধবা ইন্দির ঠাকরুন প্রতিনিয়ত বিতাড়িত হয়েছে। লাঞ্ছনা, অবহেলা ও দারিদ্র তার জীবনে নিত্য সঙ্গী হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফল-মূল সংগ্রহ করে তার জীবন

অতিবাহিত হয়েছে। নামজাদা কুলীন পরিবারে ইন্দির ঠাক্‌রুনের বিবাহ হলেও, অল্প দিনের মধ্যেই তাকে বিধবা হতে হয়। সে স্বামীর সংস্পর্শ কালভদ্রে পেয়েছে। হরিহরের সঙ্গে তার সম্পর্কের দূরত্ব একটু বেশিই। আবার সর্বজয়ার চোখে অপু ও দুর্গার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। পুত্রসন্তান অপু দুর্গার তুলনায় মাতৃজনিত স্নেহের ভাগ একটু বেশিই পায়। দুর্গার মৃত্যুকালীন বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> "আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোনো পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!"[২]

বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর ক্রমে ম্যালেরিয়া, প্রকৃতি কন্যা দুর্গা প্রকৃতির বুকেই মিলিয়ে গিয়েছে।

ইন্দির ঠাক্‌রুন ও দুর্গা যেন অসীমতার প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে উপন্যাসে। দরিদ্র হরিহরের সামর্থ্য না থাকলেও প্রকৃতির কোলে ঘুরে ঘুরে দুর্গা বন্য ফল-মূল সংগ্রহ করে। প্রথমে ইন্দির ঠাক্‌রুন ও পরে দুর্গা মারা যাওয়ার পর উপন্যাস জুড়ে সবুজতার প্রতিচ্ছবি ম্লান হতে দেখা যায়। এরপর হরিহর পরিবার নিয়ে কাশীতে অবস্থা করেছে। নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশীতে অবতারণা, গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বেনারস শহরের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গলির যান্ত্রিকতা তাদের জীবনে ডেকে এনেছিল অবসাদ। তাই অপু স্বপ্ন দেখে নিশ্চিন্দিপুর ফিরে যাওয়ার। আবার উপন্যাসে মেয়েদের পালনীয় পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি, কুলুইচণ্ডী ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃতি আরাধনার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি ব্রতের আচার পালন ও উপকরণের সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্র রয়েছে। ব্রতগুলির মন্ত্রের গীতির মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতির আহ্বান। যেমন—"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুপুরবেলা?"[৩] আবার ইন্দির ঠাক্‌রুনের দুর্গাকে শেখানো ছড়ার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতির বার্তা—"হলুদ বনে বনে—/নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে।"[৪]

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে এসে বিভূতিভূষণ আরও একবার নারী ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে তুলে ধরলেন কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতীর মধ্যে দিয়ে। যদিও এই উপন্যাসের মূল বক্তব্যই মানুষের দ্বারা প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। তার সঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল নারী ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা। বিধবা কুন্তা সামাজিক ভাবে মুসম্মত কুন্তা নামে পরিচিত। তার রাজরানি থেকে ভিখারিনী হওয়ার যাত্রাটা ভয়ানক নিষ্ঠুর। কুন্তাকে প্রথম দেখা যায় কথক সত্যচরণের এঁটো খাবারের অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করতে, তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে। ইতিহাস বলে কুন্তা বাইজির মেয়ে। তাই স্বামী মারা যাওয়ার পর আত্মীয়-পরিজনের আশ্রয় পায়নি। রাসবিহারী সিং কুন্তাকে আশ্রয় দেওয়ার নামে নিজের পৈশাচিক যৌনলালসা চরিতার্থ করতে চাইলে কুন্তা সে আশ্রয় ত্যাগ করে প্রকৃতির কোলে ফিরে গেছে। সমাজ তাকে দূরে ঠেলে দিলেও প্রকৃতিমাতা তাকে অবহেলা করেনি। প্রকৃতির দেওয়া বন্য ফল-মূল সংগ্রহ করে তার দিন চলে। জঙ্গলের মধ্যে নির্ভয়ে সে চলাচল করতে পারে। বন্য প্রকৃতির দেওয়া কুল গাছ থেকে বনকুল পাড়ার অপরাধে ইজারাদারেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়, প্রহার করে। আধুনিক নগরসভ্যতার পিতৃতন্ত্র সমাজে প্রকৃতির দান বন্যকুল 'চুরি' আখ্যা পায়। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা। যেখানে আম্র ফল সন্ন্যাসীর কোলে পড়লে, আর তা বঙ্গ মাতৃর দান হিসেবে তুলে নিলে, যমদূতবেশী জমিদারের পেয়াদারা তাকে ধরে নিয়ে যায়—"হেনকাল হায় যমদূত প্রায় কথা হইতে এল মালী, ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।"[৫]

উপন্যাসে আর এক নারী চরিত্র মঞ্চী। সহজ-সরল-সাধারণ বন্য মেয়ে মঞ্চী যেন রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' (১৩০২) গল্পের তারাপদ। সাংসারিক গৃহ বন্ধনে এরা কেউ আবদ্ধ থাকতে চায় না, তারাপদ আর মঞ্চীর মধ্যে মিল এখানেই। সীমার মধ্যে তাদের বেঁধে রাখা যায় না। তারাপদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি, মঞ্চীও সংসারের বন্ধনকে ছিন্ন করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। হতদরিদ্র মঞ্চী কৃষিজমিতে ফসল কাটুনির কাজ করে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এই কাজে সে আনন্দ পায়। উপন্যাসে তাকে প্রথম দেখা যায় খাটো সেদ্ধ করতে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মঞ্চীর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন—"... খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্নিশ করা কালো রং, নিটোল গড়ন।"[৬] স্থায়ী একটা ঠিকানা ও বাড়ি মঞ্চীর রয়েছে, তবে 'বিদেশে' থাকাতেই সে বেশি আনন্দ পায়। মঞ্চীর কৌতূহলপ্রবণ মন কলকাতা শহর দেখতে চায়। সত্যচরণকে সে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নেই? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে?"[৭] এর পরিপ্রেক্ষিতে কথকের ভাবনায় উঠে এসেছে—"এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপারখানা কি।"[৮] এভাবেই তার সরলতা বন্য-সৌন্দর্য শিক্ষিত সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছে। বালিকা স্বভাবযুক্ত মঞ্চীর প্রৌঢ় নকছেদীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সন্তানহারা মঞ্চী মাতৃশোকে ব্যাকুল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। মঞ্চী সম্পর্কে কথকের ভাবনা—

> "মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল, আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণ-যৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।"[৯]

উপন্যাসের অন্য আর এক নারী চরিত্র, রাজা দোবরু পান্নার পৌত্রী ভানুমতী। কিশোরী ভানুমতীকে দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে সে যেন এক বনদেবী। ভানুমতী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরণের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা।"[১০]

ভানুমতী ঝুলন উৎসব উপলক্ষে পরিধান করেছিল জাম রঙের শাড়ি, গলায় লাল-সবুজ হিংলাজের মালা, খোঁপায় গোঁজা ছিল লিলি ফুল। অলংকারের উপকরণ সবই বন্য ফল-মূল দিয়ে তৈরি। তার নিঃসংকোচ বন্ধুত্ব কথককে আপ্লুত করেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, এরূপ দ্বিধাহীন সংযোগ কেবল বন্য প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মেয়েরাই পারে। ভানুমতী যেন বন্য প্রকৃতির মতোই উদার, অসীম—

> "আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেনী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহারও তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মতো স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালোবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালোবাসাও বড়।"[১১]

ভানুমতীর দেশের মাটি উর্বর নয়, তাই সেখানে কৃষিকাজ হবে না। তবে যদি সেখানে কখনো তামার খনি বের হয়ে যায়, তাহলে সেখানে তৈরি হবে কারখানা। সুন্দর বনশ্রী ধ্বংস করে সেখানে ছুটে বেড়াবে কুলির দল, স্বচ্ছ ঝরণার জলের পরিবর্তে তৈরি হবে ময়লা ড্রেন, কয়লার স্তূপ জমা হবে। ক্রমে তৈরি হবে একটি বাজার। অন্যদিকে বন্য সুন্দরী ভানুমতী কয়লা ফেরি করে বেড়াবে। এমনি সব ভাবনা কথক সত্যচরণের মানস কল্পনায় ভেসে উঠেছে।

'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসে এসে নদী ও নারীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তুলে ধরলেন বিভূতিভূষণ। উক্ত

উপন্যাসে নদী হয়ে উঠেছে জীবন ও সজীবতার প্রতীক। নারী ও নদী এই দুই এক সূত্রে গাঁথা। তাই কাহিনির শুরুতেই নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার এক স্বচ্ছ মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে।

> "ক্বচিৎ উঁচু শিমূল গাছের আঁকাবাঁকা শুক্‌নো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে।"[১২]

যদিও উপন্যাসের মূল প্লট নীলকর সাহেবদেরে অত্যাচার ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি, তবে কাহিনির একাংশ জুড়ে রয়েছে নারী পরিবর্তনশীলতার কথা। নারী কেবল বস্তু নয়, তার নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এই বার্তা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তিলু, বিলু, নীলু ও নিস্তারিণীর মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনশীল নারী সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ। নিস্তারিণী ও তিলু গ্রামীণ সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে। উপন্যাস জুড়ে নারী চরিত্রগুলিকে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে কারণে নিস্তারিণী সম্পর্কে 'শক্তিময়ী মেয়ে', সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে 'শক্ত-সামর্থ্য মেয়েমানুষ' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার হুগলি জেলার কুমুদিনীকে জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে, সেই প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন লেখক। নীলকুঠির দাঙ্গায় দুলেদের বউরা তীর চালালে নীলকুঠির বরকন্দাজ ভয়ে পালিয়ে যায়। "বাগদী, দুলে, মুচি, নমুশুদ্দুদের মধ্যে অনেক মেয়ে পাবেন যারা ভাল সড়কি চালায়, কোঁচ চালায়, ফালা চালায়, কাতান চালায়।"[১৩] প্রকৃতি যেমন কখনো শান্ত, স্নিগ্ধ ও কোমল, আবার কখনো অশান্ত, দুর্নিবার তেমনি নারী হৃদয়েও কঠিক ও কোমলতা পাশাপাশি বিরাজমান।

নিস্তারিণী গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। বাড়ির অন্যান্য মেয়ে-বউরা যা করতে পারে না, সে সেই সব দুঃসাহসিক কাজ করে দেখায়। প্রকাশ্যে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, অথবা নির্ভাবনায় নদীর জলে সাঁতার দেওয়া, সবই তার দ্বারা অনায়াসে সম্ভব। তাকে দেখে ভবানীর মমতা হয়। নিস্তারিণী সম্পর্কে ভবানীর ভাবনা—

> "এ রকম সাহসী মেয়ে কত দেখেচেন সেখানে, ব্রজধামে, বিঠুরে, বাল্মীকি-তপোবনে। সেখানে কোকিলদম্বের চিরহরিৎপল্লবদলের সঙ্গে মিশে আসে যেন পীতাভ নিম্বপত্রের বর্ণমাধুরী, গাঢ় নীল কন্টকভ্রমযুক্ত লাল রঙের ফুলে ফুলে ঢাকা নিবিড় অতিমুক্তলতাঝোপের তলে ময়ূরেরা দল বেঁধে নৃত্য করবে, কালিন্দীর জলরাশিতে গাছের ছায়ায় ঘাগরাপরা সুঠামদেহী তরুণী ব্রজরমণীর দল জলকেলি-নিরতা। মেয়েরা উঠবে কবে বাংলা দেশের? নিস্তারিণীর মত শক্তিমতী কন্যা, বধূ কবে জন্মাবে বাংলার ঘরে ঘরে।"[১৪]

নিস্তারিণী সমাজের রীতি-নীতি সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্না হওয়া এক বিদ্রোহিনী নারী। সে খরস্রোতা ইছামতীর জলে গা ভাসিয়ে দিতে পারে। সমাজকে তাচ্ছিল্য করে রায়পাড়ার গোবিন্দর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে গয়া বরদা জাতিতে বাগদিনী। বড় সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুণ সকলেই তাকে সমীহ করত। গয়ার মতো মেয়েরা পুরুষের চোখে কেবল একটা 'বস্তু', তাই বিভূতিভূষণ বলেন—"গয়া মেমের সুঠাম যৌবন অনেকেরই কামনার বস্তু।"[১৫] অথচ কবিরাজ রামকানাইয়ের অসুস্থতায় এই গয়াই ছুটে এসেছে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে। আবার তিলু বিলু ও নীলু তিনজনেই মনে প্রাণে সরল বালিকা। তাই ভবানীর শান্তির জায়গা তার নিজ গৃহ ও বটবৃক্ষর তল। দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বেরোনোর কোনো নিয়ম নেই, তিলু এই রীতি ভেঙে ইংরেজ

সাহেবকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকিয়েছে। এমনকি সে লেখাপড়া শিখতে চেয়েছে, সঙ্গে তার বোনেরাও। তিলু পড়েছে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', যে অন্নদামঙ্গল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদের কাব্য।

উপন্যাসে উল্লেখিত ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত 'তেরের পালুনি', যা কেবল নারীদের উৎসব। প্রাচীন একটি জিউলি ও কদম গাছের নীচে বনভোজনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয় গ্রামের নারীরা। এরূপ বনভোজনের দৃশ্য 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসেও লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য বিষয় হল প্রকৃতি ও খাদ্য। এই বনভোজন বা চড়ুইভাতির প্রধান উদ্দেশ্য বনের মধ্যে দলবদ্ধভাবে প্রীতিভোজন অথবা প্রকৃতির সংস্পর্শে থেকে দলবদ্ধভাবে আনন্দ আহার। বনভোজন শব্দের আরও একটি সার্থক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তা হল 'বাঁধনছাড়া আনন্দ'। নিজ গৃহ থেকে যে যার সাধ্যমত খাদ্যবস্তু নিয়ে এসে একে অন্যের মধ্যে আদান-প্রদান করে একসঙ্গে খাওয়াই হল এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। সেইসঙ্গে মেয়েরা ছড়া, গান, উলু ও শঙ্খধ্বনি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রাণ সঞ্চার করে থাকে। পাঁচপোতা গ্রামের তুলসী, তিলু, বিলু, নিস্তারিণী, যতীনের বউ, নন্দরানী ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের এই অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। এই ভোজ অনুষ্ঠানের সমস্ত উপকরণই প্রাকৃতিক সামগ্রী। মূলত বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় এই ব্রত পালন করা হয়।

সৃষ্টির মূলে রয়েছে নারী। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা বলছে প্রকৃতির সুরক্ষা বজায়ে বরাবর নারীরাই এগিয়ে এসেছে। সুন্দরবনের বনদেবী 'বনবিবি' একজন নারী দেবী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি পূজিত হোন। জঙ্গল ও বন্যজন্তুর রক্ষাকর্তা তিনি। এই নারীকেই প্রকৃতির দেবী বলে মনে করা হয়। তাই 'ইছামতী'র ভবানী সমগ্র নারী জাতির মধ্যে ঈশ্বরীকে দেখতে পায়। আবার প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এই কথা ভবানী তার ছেলেকে শেখায়। অন্যদিকে 'আরণ্যক' উপন্যাসে নারী চরিত্রের আগমন ঘটছে, যখন থেকে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ-হেন ইঙ্গিত কেবল বিভূতিভূষণই হয়তো দিতে পারেন। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে পাওয়া যায় জিনপরি প্রসঙ্গ, স্থানীয় ভাষায় 'ডামাবাণু'। এই জিনপরির সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্র রয়েছে। কাহিনিতে দেখা যায় বোমাইবুরু জঙ্গলে জিনপরিকে কেন্দ্র একটি 'দুর্নাম' প্রচলিত ছিল। জিনপরিরা মানুষকে জঙ্গলের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে অথবা পাগল করে দেয়। বোমাইবুরুর জঙ্গলের আমিন রামচন্দ্র সিং পাগল হয়ে যায়, বালিয়া জেলার যে যুবকটি বোমাইবুরুর জঙ্গল ইজারা নিয়েছিল সেও মারা যায়। উক্ত জঙ্গল সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে—

> "যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছে, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।"[১৬]

প্রকৃতির বুকে মানুষের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে 'ডামাবাণু' বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে প্রকৃতি সুরক্ষার দায়বদ্ধতায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তার জন্য নির্দিষ্ট আইনের প্রচলনও রয়েছে। কিন্তু গভীর জঙ্গলে যেখানে সভ্য আইনের মূল্য গুরুত্বহীন সেখানে 'ডামাবাণু'র বিশ্বাস ও সংস্কার পালনের মধ্যে দিয়ে বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তাই 'পল্লীপ্রকৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—"... মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[১৭] সত্যচরণের হাত দিয়ে সুন্দর বনানী ধ্বংস হয়েছে, এই অপরাধবোধ থেকে সে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই সে ক্ষমা

প্রার্থনা করেছে প্রকৃতির কাছে—"হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়।"[১৮]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা বহুল এবং বিচিত্র। তবে তুলনামূলক ভাবে নারীচরিত্র সংখ্যায় কম হলেও চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রতার দাবিদার। তাঁর নারী চরিত্রগুলি পরনির্ভরতা থেকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি এটাও নির্দেশ করেছেন যে, স্বনির্ভরশীলতার সূত্রপাতটা ঘটেছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীদের দ্বারা। এখানে নিম্ন বলতে দুই শ্রেণির নারীদের বোঝানো হচ্ছে, জাতিগত ভাবে নিম্নবর্ণের, অন্যটি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক নারী সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণির মধ্যে ফেলা যায় মঞ্চীকে আর দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে গয়া মেম ও কুন্তাকে। আবার ইন্দির ঠাক্‌রুন, দুর্গা, গয়া, মঞ্চী, ভানুমতী, নিস্তারিণী—এরা প্রত্যেকেই চরম দারিদ্র্যে জর্জরিত। তাই এরা সকলেই অরণ্যচারিণী গ্রাম্যকন্যা, প্রকৃতি থেকে তাদের আলাদা করে দেখা যায় না। প্রত্যেকেই সমাজে স্থান না পেয়ে ছুটে গেছে প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতি তাদের নিরাশ করেনি। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী অতি-সামান্য সাবান চিরুনি অত্যধিক মূল্যে ঠকিয়ে নিতে পারে সরল মঞ্চীর কাছ থেকে, আবার বিধবা কুন্তাকে রাসবিহারী সিং-এর লালসার শিকার হতে হয়। এখানেই 'পুরুষতন্ত্র'-এর আধিপত্য মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতি ও নারী উভয়ের প্রতি অবদমন। নারী ও প্রকৃতি যে অভিন্ন সত্তা এবং উভয়ই 'সমাজ' দ্বারা সংকটময় পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে সেই বার্তাই দিয়ে গেলেন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের হাতে গোনা কয়েকটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'পথের পাঁচালী', 'ইছামতী' ও 'আরণ্যক' এই তিন উপন্যাসে নারী চরিত্রায়ণের তিনটি পর্যায় দেখানো হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গা ও ইন্দির ঠাক্‌রুন নিতান্তই গ্রাম্য নারী। গ্রাম্যজীবন ও পল্লি-প্রকৃতি থেকে তাদের আলাদা করে দেখা যায় না। 'আরণ্যক'-এ এসে দেখা যায় ভানুমতী, মঞ্চী ও কুন্তারা অনেকটাই পরিণত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে তারা সরাসরি প্রতিবাদ না করলেও উক্ত সমাজের অন্যায় তারা মেনে নেয়নি। কিন্তু 'ইছামতী'তে এসে নিস্তারিণীর স্বেচ্ছাচারিতা যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ। অথচ ইন্দির ঠাক্‌রুন থেকে নিস্তারিণী এই দীর্ঘকালীন পর্যায়ে বিভূতিভূষণ নারীর মনস্তত্ত্বের যে স্তর তুলে ধরলেন, তার মধ্যে নারী হৃদয়ের নৈসর্গিক কোমলতাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করলেন না। তাই বিভূতিভূষণ 'ইছামতী'তে এসে ভবানীর মানসে বলা করালেন—

> "মেয়েরাই সেই দেবী, যারা জন্মের দ্বারপথের অধিষ্ঠাত্রী—অনন্তের রাজ্য থেকে সসীমতার মধ্যেকার লীলাখেলার জগতে অহরহ আত্মাকে নিয়ে আসচে, তাদের নবজাত ক্ষুদ্র দেহটিকে কত যত্নে পরিপোষণ করচে, কত বিনিদ্র উদ্বিগ্ন রাত্রির ইতিহাস রচনা করে জীবনে, কত নিঃস্বার্থ সেবার আকুল অশ্রুরাশিতে ভেজা সে ইতিহাসের অপঠিত অবজ্ঞাত পাতাগুলো।"[১৯]

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সংকলন', ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, ১৩৩২, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৩, আষাঢ়, পৃ. ১১৮-১১৯। (https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8, Retrieved on 09-12-2024)।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, ২ অক্টোবর, ১৯২৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৭৮।

৩. তদেব, পৃ. ৫৯।
৪. তদেব, পৃ. ১৫৮।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কথা ও কাহিনী', বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, শ্রী সুধাংশুশেখর ঘোষ (প্রকাশক), পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র-১৩৯৮, . ১৪২।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৫, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ১২১।
৭. তদেব, পৃ. ১২০।
৮. তদেব, পৃ. ১২১।
৯. তদেব, পৃ. ১৬০।
১০. তদেব, পৃ. ১৩৬।
১১. তদেব, পৃ. ১৬২।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী', ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এস.এন. রায় (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ. ১।
১৩. তদেব, পৃ. ৮৯।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৭।
১৫. তদেব, পৃ. ৪৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৬।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পল্লীপ্রকৃতি', বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩১৩, পৃ. ৮৬।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৫, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২২৩।
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী', ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এস.এন. রায় (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ. ১১২।

পূজা ভুঁঞে
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ

জয়া গোয়ালার ছোটগল্প : প্রান্তিক মানুষের স্বর ও সমাজ বাস্তবতার নির্মম চিত্র

রিয়াঙ্কা দেবনাথ

ভারতবর্ষ বরাবরই বৈচিত্র্যের পটে আঁকা এক বিস্ময়চিত্র। কালের নিয়মে, ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে তার বিস্তৃত ভূগোল আজ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা নামের রাষ্ট্রে, বিভক্ত হয়েছে রাজ্য-রাজনীতির হিসেবনিকেশে। তবু, তার প্রতিটি কোণে রয়ে গেছে একেকটি অধ্যায়, একেকটি সংস্কৃতির গল্প। তেমনই এক অধ্যায় ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের সবুজে মোড়া পার্বত্য রাজ্য, যেখানে মেঘ নেমে আসে গাছের ডালে, আর বাতাস বয়ে আনে অতীতের অনুরণন। ত্রিপুরার ইতিহাস সুদীর্ঘ, তার শাসনভার বহুকাল ছিল মাণিক্য রাজবংশের হাতে। একদা 'পার্বত্য টিপ্পেরা' নামে পরিচিত এই রাজ্য স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৭ সালে, একীভূত হয় ১৯৪৯ সালে এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এখানকার ভাষারীতিও কম বৈচিত্র্যময় নয়—বাংলার পাশে করবরক, হালাম, চাকমা, আর লোকাচার-নির্ভর ছিলোমিলোর সুর মিশে তৈরি হয়েছে এক অনন্য বর্ণচ্ছটা।

এই ত্রিপুরার সাহিত্যাঙ্গনে এক উজ্জ্বল নাম জয়া গোয়ালা। জন্ম এক চা-শ্রমিক পরিবারে, মনতলা চা-বাগানের কোলে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে যে জীবন, সে জীবন রচনা করেছে তার সাহিত্যের ভিত। বাবার কর্মস্থল ছিল চা-বাগান। ফলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিটি কষ্ট, প্রতিটি বঞ্চনা ছিল তার নিত্য-অভিজ্ঞতার অঙ্গ। লেখার সূচনা আঠারো বছর বয়সে, ১৯৮৪ সালে 'পলাশপুরের মেয়ে' গল্পের মধ্য দিয়ে। তারপর একে একে 'পার্বতীয়া', 'সনিয়া', 'ছড়া জলের ছবি' সব গল্পেরই এক মূল সুর, প্রান্তিক জীবনের অলিখিত ইতিহাস।

জয়া গোয়ালার ভাষা শুধু বাংলা নয়, তার লেখায় মিশেছে চা-শ্রমিকদের ছিলোমিলো ভাষার ধ্বনি, তাদের কথ্যরীতির সহজতা, তাদের দুঃখগাথার নিভৃত সুর। সাহিত্যের মসৃণ পরিসরে তিনি টেনে এনেছেন জীবনের অসম রুক্ষতা। সমাজের রক্তমাংসের মানুষ, যারা কেবল দেয়, কিছু পায় না তাদের কথাই তার লেখার প্রাণ। নিজেই একসময় বলেছিলেন—

> "আমি ভালোবাসি মাটি, ভালোবাসি মাটির মানুষদের। যারা শুধু দিয়ে যায়, পায় না কিছুই তাদের কান্না, ঘাম, রক্তের কাহিনি বলাই আমার উদ্দেশ্য। জানি না, সমাজের কতটুকু কাজে আসবে, তবু লিখব।"[১]

এমন এক সাহিত্যিক, যিনি নিজেই ছিলেন গল্পের চরিত্রের মতো সংগ্রামী, অবহেলিত, অথচ প্রতিভায় দীপ্ত তাকে আমরা হারিয়েছি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাননি। তার গল্পগুলোর প্রতিটি শব্দ আজও বলে চলে এক অবহেলিত ইতিহাস, এক সংগ্রামী জীবনের আখ্যান।

> "বাবুমশাইরা জবাব দেও।
> একটা জব্বর জবাব মাঙছি গ বাবুমশাই
> শুনছি ইবারও নাকি দেশ স্বাধীন হইল..."[২]

জয়া গোয়ালার কবিতা 'সব বকোয়াস' যেন স্বাধীনতার পরিহাসের এক তীব্র দলিল। স্বাধীনতা দিবসের আড়ম্বর

দেবনাথ, রিয়াঙ্কা : জয়া গোয়ালার ছোটগল্প : প্রান্তিক মানুষের স্বর ও সমাজবাস্তবতার নির্মম চিত্র
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 21, No. 2, December 2024, Pages : 33-43, ISSN 2249-4332

আর চা-বাগানের শ্রমিকদের দারিদ্র্যের গভীর বৈপরীত্য এই দ্বৈরথেই নিহিত আছে এক কঠিন সত্য। একদিকে শহরের রাজপথে জাতীয় পতাকার আবহে মেতে ওঠা মানুষ, অন্যদিকে চা-বাগানের লছমনিয়া, যার স্বামী কাজের অভাবে পরিণত হয়েছে 'জিন্দালাশ'-এ। এ কেমন স্বাধীনতা? কে জবাব দেবে?

জয়া গোয়ালা নিজে চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর কলমে উঠে এসেছে শ্রমিকদের নিদারুণ বাস্তবতা। পাহাড়ঘেরা ত্রিপুরার মাটি, চা-বাগানের ঘ্রাণ, শ্রমিকের ক্লান্ত শরীর, খালি হাঁড়ি এসব তাঁর রচনার মুখ্য উপাদান। জন্মসূত্রেই তিনি নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষের ব্যথা অনুভব করেছেন, তাই তাঁর গল্পে-কবিতায় তাদের কথা কেবল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি, বরং রক্ত-মাংসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পরেও চা-শ্রমিকরা সেই পূর্ববর্তী শৃঙ্খলেই বন্দি। কাজ আছে তো দুটো ভাত জুটবে, কাজ নেই তো অনাহার। 'দুই পাতা, একটি কুঁড়ি' যারা তোলে, তারা কি পেয়েছে জীবনধারণের ন্যূনতম নিশ্চয়তা? রাষ্ট্র তাদের দিয়েছে সংবিধানের কেতাবি স্বীকৃতি, কিন্তু বাস্তবিক জীবনে? শ্রমের ন্যায্য মূল্য? অধিকার? নিরাপত্তা? বাবুমশাইরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না, কারণ উত্তর তাদের জানা থাকলেও মুখ খুলতে ভয় পান।

জয়া গোয়ালার রচনায় যে বিদ্রোহের সুর, তা কোনো তাত্ত্বিক বিপ্লবের বুলি নয়, বরং জীবনসংগ্রামের ভিতর থেকে উঠে আসা এক চিৎকার। 'সনিয়া', 'ছড়া জলের ছবি' সবখানেই তিনি শ্রমজীবী মানুষের গল্প বলেছেন, তাদের তিলতিল করে ক্ষয়ে যাওয়া অস্তিত্বের কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, কখনও কখনও শ্রমিকদের মুখের ভাষাই তিনি অবলম্বন করেছেন। 'ছিলোমিলো' ভাষার ব্যবহার তাঁর গল্পে চা-শ্রমিকদের জীবনকে করে তুলেছে আরও বাস্তবসম্মত। প্রান্তিক মানুষের গল্প লিখতে লিখতে মাত্র ৪৮ বছর বয়সেই তিনি চলে গেলেন। কিন্তু প্রশ্ন রেখে গেলেন স্বাধীনতা কি কেবল শহরের রাস্তায় পতাকা ওড়ানো? স্বাধীনতা কি কেবল বাবুমশাইদের বক্তৃতা? স্বাধীনতা কি পৌঁছেছে পাহাড়ের আড়ালে, চা-বাগানের খুপরি ঘরে? লছমনিয়ার মতো শ্রমিকদের কান্নার উত্তর হয়তো আজও কেউ দেয়নি। তবে জয়া গোয়ালার লেখনী সে প্রশ্নকে মুছে যেতে দেয়নি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মতো ত্রিপুরাও এক বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দেশভাগের অভিঘাত এ রাজ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষত, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নেয়, যা জনসংখ্যায় এক আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটায়। একদিকে নতুন শরণার্থীদের বসবাসের জন্য জমি ও সম্পদের সংকট, অন্যদিকে স্থানীয় জনজাতির ভূমি হারানোর আশঙ্কা এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই গভীর হতে থাকে। ফলে ত্রিপুরার সামাজিক কাঠামোয় এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটলেও, তার সঙ্গে বেড়ে ওঠে সংঘাত ও টানাপোড়েনের উপাদান। শুধু উদ্বাস্তু সমস্যা নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী ত্রিপুরার এক বড় বাস্তবতা ছিল শ্রমজীবী শ্রেণির দুর্দশা। চা-বাগানের শ্রমিকরা ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার ছিল, স্বাধীনতার পরেও সেই পরিণতি বিশেষ বদলায়নি। কাজের নিদারুণ কষ্ট, মজুরির অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং শিক্ষার সুযোগের সংকীর্ণতা শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছিল। এই শ্রমজীবী মানুষদের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন না আসায় অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

এর পাশাপাশি, ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায় এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। উদ্বাস্তু জনস্রোতের চাপে তারা ক্রমাগত নিজস্ব জমি হারাতে থাকে এবং একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হলেও ক্ষমতার কাঠামো থেকে তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিচয় সংকটের এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে তাদের দাবিদাওয়া অবহেলিত হতে থাকে, যা

পরবর্তীকালে আন্দোলন ও প্রতিরোধের জন্ম দেয়। সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি, স্বাধীনতার পর ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অস্থির হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত, ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা এবং শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনের টানাপোড়েন রাজ্যে এক অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। আন্দোলন, প্রতিবাদ, এমনকি দাঙ্গার ঘটনাও ঘটতে থাকে। স্বাধীনতার আলো এসে পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু তার ছায়ার আড়ালে থেকে গিয়েছিল বহু সংকট। একদিকে উন্নয়নের স্বপ্ন, অন্যদিকে বঞ্চনা ও প্রতিরোধের বাস্তবতা এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই স্বাধীনতা-পরবর্তী ত্রিপুরার ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে।

জয়া গোয়ালার সাহিত্যকর্ম ত্রিপুরার স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিচিত্র। চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বসংকট, নারীদের বহুমাত্রিক সংগ্রাম এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে থাকা অসাম্যের গল্প তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তববাদী ভাষ্যকল্পনার আড়ালে কোনো সৌন্দর্যবিলাস নয়, বরং জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথযাত্রার সরল কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ।

স্বাধীনতা লাভের পরেও ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতায় যে পরিবর্তন আসেনি, তা তাঁর গল্পগুলিতে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। দেশ স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক নিপীড়ন এবং নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের ঔদাসীন্য অটুট ছিল। চা-বাগানের শ্রমিকরা একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের উত্তরাধিকার বয়ে বেড়াচ্ছিল, অন্যদিকে স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতেও তাদের অবস্থানের বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। তাঁদের কাজের পরিশ্রম বহুগুণ, অথচ মজুরি অতি সামান্য। তাদের সন্তানদের জন্য নেই শিক্ষা, নেই চিকিৎসা, এমনকি সামান্য খাদ্যের নিশ্চয়তাও। এই কঠিন বাস্তবতার কথা জয়া গোয়ালা তাঁর লেখনীতে আন্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের কথাই নয়, ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংকটও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। শরণার্থী স্রোতের কারণে আদিবাসীদের ভূমি হারানোর কষ্ট, সংস্কৃতি হারানোর ভয় এবং পরিচয় সংকটের গভীর যন্ত্রণা তিনি চিত্রায়িত করেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীদের প্রতি যে বিমাতা-সুলভ আচরণ করা হয়েছিল, তা তাঁর গল্পে বারবার ফিরে এসেছে। নারীর জীবনসংগ্রামও জয়া গোয়ালার সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রমজীবী নারীরা কেবল অর্থনৈতিক শোষণের শিকারই নয়, পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নানা ধরনের নিপীড়নের মুখোমুখি হয়। তাঁর লেখায় নারী শুধুমাত্র এক করুণ চরিত্র নয়, বরং সংগ্রামী এক প্রতিমূর্তি, যে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যায় প্রতিনিয়ত।

জয়া গোয়ালার ভাষারীতি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজবোধ্য। তিনি সরল ভাষায়, সংলাপপ্রধান বর্ণনায়, কখনও কখনও ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে গল্পগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। শ্রমজীবী মানুষদের কথ্যভাষার অন্তর্নিহিত লালিত্য এবং চা-বাগানের নিজস্ব বিভাষা তাঁর গল্পে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এতে কেবল সাহিত্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং চরিত্রগুলোর সঙ্গে পাঠকের সংযোগ আরও গভীর হয়। আশির দশকের নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার প্রবাহে জয়া গোয়ালার সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সমাজের প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-ভঙ্গ, সংগ্রাম-হতাশার যে আখ্যান তিনি তুলে ধরেছেন, তা কেবল ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চা নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ত্রিপুরার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার জন্য তাঁর সাহিত্যকর্ম অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জয়া গোয়ালার ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যেখানে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ও পরিচয় সংকটকে তিনি গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষত, তাঁর গল্পে চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম

ও তাদের সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'পার্বতীয়া' গল্পটি চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে জাতি, লিঙ্গ ও শ্রেণিবৈষম্যের জটিলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পার্বতীয়া (পারু) ও মংলুর প্রেম কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি এক সামাজিক লড়াই। পারু এক সাঁওতালী মেয়ে, আর মংলু ঘাটুয়াল সম্প্রদায়ের ছেলে তাদের সম্পর্ক সমাজের চোখে 'বেমিল' এবং নিষিদ্ধ। এখানে দেখা যায়, বৈষম্য শুধু ধনী-গরিব, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিম্নবর্গের মধ্যেও রয়েছে ভেদাভেদ।

গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রথাগত সমাজব্যবস্থা কীভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে এবং নারীদের প্রতি দ্বিচারিতার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে। পারুর মা সমাজের অনুশাসনের প্রতিনিধি, যিনি মেয়েকে সতর্ক করে দেন—

> "এ পারুর বা, তুই কি দেখতে নাই পাচ্ছিস লেড়কীটা ঘাটুয়াল ছকড়াটার সঙ্গে কেমন মিশছে। হামরা লাগি সাঁওতাল আর অরা 'দিকু' ঘাটুয়াল জাত।"[৩]

এই উক্তি নিম্নবর্গীয় সমাজেও জাতভেদ প্রচলিত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে। পারুর পরিবার চায় সে তার জাতভাইয়ের সঙ্গেই বিয়ে করুক, কিন্তু পারু ও মংলু নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেয় এবং সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের এই বিদ্রোহ সামাজিক কাঠামোর প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। পারুর পরিবার যখন সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন তাদের একঘরে করে দেওয়ার হুমকি আসে। সমাজের শাস্তি পালনে প্রধান ভূমিকা নেয় 'চাটাই' এক ধরনের স্থানীয় সমাজনেতা, যার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। পারুর বাবা এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তাকে সমাজচ্যুত করতে রাজি হন, কিন্তু তখনই প্রবেশ করে গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গণেশ পাগলা। গণেশ পাগলা গল্পের পরিবর্তনের প্রতীক। তিনি কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং পারুর বাবাকে বোঝান যে সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সময় এসেছে। তাঁর জাগরণী ঝুমুর গান—

> "শুন শুন বাবুজন করি হামি নিবেদন।
> বলি হামি দুহাতে জোড় করি
> চলরে ভাই নতুন সমাজ গড়ি।"[৪]

এই গান সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান, যা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর আত্মসচেতনতার প্রতীক হয়ে ওঠে। গণেশের যুক্তির মুখে পারুর বাবা উপলব্ধি করেন যে, মেয়ের সুখই প্রকৃত সমাজনীতি হওয়া উচিত এবং তিনি কুসংস্কার ভেঙে মেয়েকে মেনে নেন। তাঁর উপলব্ধির ভাষ্য—

> "কি গো দুখিয়া দাদা, শুনলম বেটিটাকে বলে গাঙে ভাসাই দিলি? তরা আইজও একেই রকম রয়ে গেলি দাদা। কেনে, অইন্য জাতে গেল তো, তো কি হইল? ... একটু ভাবলেই ত তরা বুঝতে পারবি যে উ এমন কন বেশী খারাপ কাম নাই করেছে যে, উয়াকে শারাদ্ধ করে দিতে হবেক জলদি মরবার লাগি।"[৫]

এই উক্তি নিম্নবর্গের মধ্যেও প্রচলিত কুসংস্কারের কঠোর সমালোচনা। অবশেষে পারুর বাবা সমাজের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ান। এটি নিম্নবর্গের মধ্যে আত্মপরিচয়ের জাগরণ ও সচেতনতার এক প্রতীকী উদাহরণ। 'পার্বতীয়া' শুধু এক প্রেমের গল্প নয়, এটি সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের কাহিনি। জয়া গোয়ালা গল্পটিতে নিম্নবর্গীয় সমাজের দ্বন্দ্ব, নারীর স্বাধীনতা, এবং পরিচয় সংকটকে গভীরভাবে

উপস্থাপন করেছেন। পারুর বিদ্রোহ ও গণেশ পাগলার আহ্বান নিম্নবর্গের নতুন সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচিত্র।

জয়া গোয়ালার সাহিত্য শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় জীবনের দলিল নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনেরও ভাষ্য। তিনি যে বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের স্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর গল্পগুচ্ছ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ তখনই পূর্ণ হয়, যখন সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রকৃত ন্যায়বিচার ও সমান অধিকারের স্বাদ পায়।

জয়া গোয়ালার ছোটগল্পে শ্রেণিবৈষম্য ও ক্ষমতার অসম বণ্টন একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। তিনি নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমাজের অবহেলা এবং শোষণের দিকটি ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর গল্প 'রক্ত' শ্রেণিবৈষম্যের নির্মম বাস্তবতাকে প্রকাশ করে, যেখানে ক্ষমতা ও সম্পদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য গড়ে ওঠে। গল্পের প্রেক্ষাপট ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, যেখানে চিকিৎসা নামের মানবিক সেবাও শ্রেণিবিভাগের নিয়ম মেনে চলে। চিকিৎসা এখানে নিছক সেবামূলক নয়, বরং ক্ষমতাবানদের জন্য এক ধরনের পণ্য, যা টাকার বিনিময়ে কেনা যায়। নিম্নবর্গের শ্রমিক নারীরা হাসপাতালে এলেও, তারা শুধুমাত্র অবহেলা ও তিরস্কার পায়। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় একদল শহুরে বাবুরা দ্রুত চিকিৎসা ও রক্ত পায়, অথচ চা-বাগানের গরিব শ্রমিক নারীরা শুধুমাত্র উপেক্ষিত হয়। শ্রমিক নারী মুনিরা, আহ্লাদী, গুমতি তারা হাসপাতালের ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু সেই শোষণকে ঠাট্টার ছলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুনিরার সংলাপ—"পইসাওলা হইল গিয়া মানুষ-হেরারে-এনা গদিত হুতাইবো। আমরা কিতা-আল্লা বিচার কইরো।"[৬] এই সংলাপে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার অসাম্য এবং গরিব মানুষের প্রতি ব্যবস্থার অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। হাসপাতালের প্রসূতিবিভাগের অব্যবস্থাপনা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন একজন ট্রাইবাল প্রসূতি নারী চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। এ দৃশ্য দেখে গুমতির মনে অসহায় ক্ষোভ জন্ম নেয়—

> "গুমতি বুঝতে পারে না কেন মুখে কুলুপ আঁটা। মুখ বুজে মেনে চলা। বুকের হিমহিমানি ওকে পাগল করে তোলে"।[৭]

গুমতি একমাত্র নারী চরিত্র, যে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়। কিন্তু তার প্রতিবাদের ভাষা হতাশার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়—

> "পকেটে মাল ঢুকায় দিলে খুশ নইলে থাকপাক্কায় গিরে। মর্! কার কী! সব দেখছি তো! হামরা অরাকে জমিনের ভগমান বলি। আর অরা-পাক্কা শয়তান। পুলিশ আর গেইটের অদেরলেও বেশি ভিখমাঙ্গা!"[৮]

এই সংলাপে হাসপাতালের দুর্নীতি, ক্ষমতাবানদের নিষ্ঠুরতা এবং দরিদ্রদের প্রতি রাষ্ট্রীয় অবহেলার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। গুমতির কণ্ঠস্বর শুধু একজন চা-বাগান শ্রমিকের নয়, এটি সমগ্র নিম্নবর্গের প্রতিবাদী সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। 'রক্ত' গল্পে নারীরা শুধুমাত্র শ্রেণিবৈষম্যের শিকার নয়, বরং লিঙ্গভিত্তিক শোষণও তাদের উপর চেপে বসেছে। নিম্নবর্গীয় নারীরা একদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবদমন সহ্য করে, অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈষম্যের শিকার হয়। জয়া গোয়ালা গল্পটিতে নারীদের লড়াইকে কেবল ব্যক্তিগত সংগ্রাম হিসেবে দেখাননি, বরং এটি সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে এক বৃহত্তর প্রতিবাদের রূপ নেয়। 'রক্ত' গল্পটি কেবলমাত্র এক হাসপাতালের গল্প নয়, এটি সমাজের সার্বিক শ্রেণিবৈষম্য ও নারীর প্রতি অবিচারের প্রতিচিত্র। জয়া গোয়ালা এখানে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীদের দুর্দশা, রাষ্ট্রীয় অবহেলা এবং ক্ষমতাবানদের প্রতি শ্রেণিগত সুবিধার চিত্র

অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর নারীরা নিছক ভুক্তভোগী নয়, তারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য সচেতন এবং প্রতিবাদী। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শ্রেণিবৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি স্বাস্থ্যসেবা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত। গুমতির মতো চরিত্রগুলো আমাদের ভাবতে বাধ্য করে এই বৈষম্যের শেষ কোথায়? জয়া গোয়ালার সাহিত্য আমাদের নিম্নবর্গের সংগ্রামকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং পরিবর্তনের পথ দেখায়।

জয়া গোয়ালার 'স্বাধীনতার সোয়াদ' গল্পটি দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষের দুর্দশা এবং স্বাধীনতার নামে চলা প্রতারণার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সনকুমারী, এক বৃদ্ধ শ্রমজীবী নারী, যার জীবন সংগ্রাম স্বাধীনতার আসল রূপকে উন্মোচিত করে। তিনি নিম্নবর্গীয়, শ্রমজীবী, শোষিত—একদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশের অত্যাচার সহ্য করেছেন, আবার স্বাধীন ভারতের নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

দেশভাগ নিম্নবর্গের মানুষের জন্য শুধু একটি ভূখণ্ডের পরিবর্তন ছিল না, বরং এটি তাদের পরিচয়ের সংকট তৈরি করেছিল। সনকুমারীর জীবনে দেশভাগ শুধু ইতিহাসের একটি ঘটনা নয়, বরং এটি তার অস্তিত্বের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ছত্তিশগড় থেকে স্বামীর সঙ্গে আসা, চা-বাগানের শ্রমজীবন এবং শোষণের চক্রে বন্দি থাকার অভিজ্ঞতা তাকে উপলব্ধি করিয়েছে—এই স্বাধীনতা আসলে তার নয়। গল্পে দেশভাগের রাজনৈতিক বাস্তবতার বিপরীতে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার আগে খদ্দরের কাপড় পরা নেতারা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা সম্মান পাবে, ঘর পাবে, কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে, নতুন এক ন্যায্য সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু স্বাধীনতা এলেও তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং জীবন সংগ্রাম আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পরও চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার থামেনি। সনকুমারীর স্বামী মালিকের শোষণের শিকার হয়ে একসময় হাত কাটা পড়ে এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্রের শাসনে এসেও নিম্নবর্গের মানুষের জন্য কোনো পার্থক্য তৈরি হয়নি। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট আগের মতোই রয়ে গেছে। শ্রমিকদের মধ্যে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, সত্যবান ও মারাংকাকারা নামে কয়েকজন বিপ্লবী নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখায়—যেখানে কেউ মালিক হবে না, কেউ মজদুর হবে না, সবাই সমান হবে। তারা বলে—

> "সহজ-সরল ভাষায় ওরা ঘোষণা করে-ওরা নাকি একটা 'লতুন সমাজ'-এর জন্য লড়ছে, রক্ত দিচ্ছে দেশে-দেশে। যে সমাজটা ওরা চায়, সেখানে মালিক-মজদুর কেউ থাকবে না, আমিরী-গরিবী থাকবে না। সবাই সমান। একটা রুটিও নাকি ওরা ভাগ করে খাবে।'[৯]

কিন্তু বাস্তব হল, সেই সমাজ কখনোই গড়ে ওঠেনি। কারণ এই নতুন সমাজ গঠনের চেতনা শোষকদের মুখোশ উন্মোচন করে, ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে শাসক শ্রেণি কখনোই সেই সমাজ গড়ে উঠতে দেবে না। সনকুমারীর হতাশা ও স্বাধীনতার অর্থহীনতা সনকুমারীর জীবনে স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই, কারণ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আগের মতোই কঠিন। তার ক্ষুধা মেটে না, তার দারিদ্র্য কমে না, তার শ্রমের শোষণ থামে না। তাই সে যখন স্বাধীনতা দিবসের কথা ভাবে, তখন তার মনে হতাশা ভর করে।

> "ঐ স্বাধীনতাই সত্যিকারের স্বাধীনতা। ওটা এলে বেশ হতো। এই বুড়ো বয়সে কোদাল চালিয়ে সব্জি ফলাতে হতো না। ঝাঁকা মাথায় বাজারে আসতে হতো না এত পথ পেরিয়ে। ভুখা পেটে

> দানব বসত গাঁড়ত না। এ স্বাধীনতা আসলি নয়। একদম 'বকোয়াস'। ... -না-না, আজ স্বাধীনতা দিন নাই লাগে, নাই লাগে।'[১০]

এই সংলাপটি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষিত স্বাধীনতা নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। বরং তারা আগের চেয়ে বেশি শোষিত হয়েছে, তাদের জীবনের দুর্দশা বেড়েছে।

জয়া গোয়ালার 'স্বাধীনতার সোয়াদ' গল্পটি শুধু দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের দুর্দশা নয়, বরং নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য স্বাধীনতার অর্থহীনতা ও শ্রেণিশোষণের চক্রকে তুলে ধরে। সনকুমারীর মতো মানুষের জন্য স্বাধীনতা শুধুমাত্র একটি দিন, যা রাষ্ট্র উদযাপন করে, কিন্তু যার বাস্তব কোনো মূল্য নেই। এই গল্প রাষ্ট্রীয় প্রচারিত স্বাধীনতা ও বাস্তবতার মধ্যকার বিভ্রান্তির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করে। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার, সুযোগ এবং সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। অন্যথায়, এটি শুধুই এক শ্রেণির জন্য ক্ষমতা ও শোষণের আরেকটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

জয়া গোয়ালার 'সনিয়া' গল্পটি শুধুমাত্র একজন নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী নারীর দুঃখগাথা নয়, এটি শ্রেণি, লিঙ্গ ও জাতিভিত্তিক শোষণের এক নির্মম দলিল। এই গল্পে সমাজের ক্ষমতাবান শ্রেণির লালসা, শ্রমজীবী নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়ন এবং নিম্নবর্গের মানুষের ওপর বহুমুখী শোষণের নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের মূল চরিত্র সনিয়া মুণ্ডা, পুরুলিয়া থেকে আগত এক সাঁওতালী মরশুমী শ্রমিক, যে ইটভাটায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার একমাত্র অবলম্বন তার কন্যা চান্দনী, যাকে সে শত দারিদ্র্যের মধ্যেও আগলে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ইটভাটার পচা-গলা বাস্তবতা তাকে প্রতিনিয়ত লজ্জা, ভয় ও আপসের মধ্যে টেনে আনে। এই গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হল একজন মা হিসেবে সনিয়ার দ্বন্দ্ব। সে জানে, তার আশপাশের পরিবেশ কতটা কলুষিত, কতটা নিষ্ঠুর, কিন্তু সমাজের ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে সে একা দাঁড়াতে পারে না। ইটভাটার ম্যানেজারবাবু, যে মূলত উঁচুতলার প্রতিনিধি, সে সনিয়াকে ঘৃণ্য এক প্রস্তাব দেয়—

> "অ তুই তা'লে একাজ পারবি না? ঠিক আছে, তুই যে দাদন নিয়েছিলি তার কথা মনে আছে তো? তার সব কিন্তু কাটা হয়নি। এ-সপ্তাহ থেকে তোর সমস্ত মজুরি কেটে নেব। দাদনের টাকা শোধ করতে হবে তো, নাকি? শালা! কোথায় মাইনে ডবল করে দেব ভেবেছিলাম আর এখন ... যা, না খেয়ে মর্ শালা!'[১১]

এই সংলাপে শ্রমজীবী মানুষের ঋণের ফাঁদ ও শোষণের বাস্তবতা উঠে আসে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাদন (অগ্রিম টাকা) দিয়ে পরাধীন করে রাখে, ফলে তারা কখনোই মুক্ত হতে পারে না। এই প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং শ্রমজীবী নারীদের ওপর যৌন শোষণের এক কৌশল। সনিয়া এই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না, কারণ তার দারিদ্র্য ও সামাজিক অবস্থান তাকে বাধ্য করে আপস করতে। ধীরে ধীরে সে সমাজের গৎবাঁধা নিয়ম মেনে নেয় এবং নিজের বিবেককে দমিয়ে রাখে। রাতের অন্ধকারে সে মালিকের শয্যা উষ্ণ করে আর বিনিময়ে পায় কড়কড়ে নোট। কিন্তু এই আপসের জন্য সনিয়াকে সমাজেরই একাংশ অভিশপ্ত করে—"পরের লাগিন গাঁতা খুঁড়লে নিজেই একদিন ঐ গাতায় গিরে যাঅন লাগে জানিস তো?"[১২], "মরণ হয় না তর সনিয়া! উপরে যদি ভগমান থাকে তবে দেখবি হামার মত তর বেটিরও দশা এমনই হবেক। তর পাপের সাজা একদিন হবেই হবেক।"[১৩] এই সংলাপগুলি সমাজের নিচুতলার নারীদের প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বিচারিতার প্রতিচ্ছবি। সমাজ একদিকে এই নারীদের শোষণের শিকার হতে বাধ্য করে, অন্যদিকে তাদের পাপী সাব্যস্ত করে। গল্পের সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি আসে

যখন সনিয়ার অবর্তমানে ম্যানেজারবাবু তার কন্যা চান্দনীকে ধর্ষণ করে খুন করে। এই ঘটনাটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য নয়, এটি শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের বাস্তব প্রতিফলন। নিম্নবর্গের মেয়েরা বারবার ধর্ষিত হয়, হত্যা করা হয় এবং এইসব ঘটনা সমাজে চাপা পড়ে যায়। সনিয়াকে ইটভাটা থেকে বের করে দেওয়া হয় যেন সে নিজেই অপরাধী। এই ঘটনাটি প্রতীকীভাবে দেখায়, কিভাবে সমাজের ক্ষমতাবানরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়, আর শোষিতরাই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়।

'সনিয়া' গল্পটি কেবল একটি মায়ের দুঃখগাথা নয়, এটি সমাজের পঙ্কিলতার নির্মম চিত্রায়ন। প্রতিদিন খবরের কাগজে নিম্নবর্গীয় নারীদের ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা উঠে আসে, কিন্তু এই অপরাধীরা দণ্ডিত হয় না, কারণ তারা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। গল্পটি পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে কেন নিম্নবর্গীয় নারীদের দেহই ক্ষমতাবানদের লালসার শিকার হয়? কেন এই ধর্ষণ-হত্যাগুলি ধামাচাপা পড়ে যায়? কেন সনিয়ার মতো নারীদের পাপী বলা হয়, অথচ শোষকরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়? কেন স্বাধীনতার পরেও নিম্নবর্গীয়, শ্রমজীবী, দরিদ্র নারীদের জন্য কোনো নিরাপত্তা নেই? জয়া গোয়ালা 'সনিয়া' গল্পে একটি পিতৃতান্ত্রিক, শ্রেণি-নির্ভর ও জাতিভিত্তিক নিপীড়নমূলক সমাজব্যবস্থার নগ্ন রূপ তুলে ধরেছেন। এটি শোষিত মানুষের বাস্তবতা, লিঙ্গ ও জাতিভিত্তিক বৈষম্যের গভীর চিত্র। গল্পের শেষ বার্তা অত্যন্ত শক্তিশালী—শোষিতরা যুগে যুগে ক্ষমতাবানদের হাতে হেরে যায়, কিন্তু তাদের দুর্দশা কখনোই সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে না, যদি না সমাজের কাঠামো বদলায়।

বাংলা সাহিত্যে জয়া গোয়ালার ছোটগল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সমাজবাস্তবতার নির্মম রূপকে তুলে ধরে। তাঁর গল্পগুলির মূল শক্তি নিহিত তীব্র বাস্তববাদী বয়ান, নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রভুত্বশীল ও শোষিতের মধ্যকার সংঘাতের বিশ্লেষণে। জয়া গোয়ালার গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রমজীবী, নিম্নবর্গীয়, দলিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবন। তাঁর কাহিনিগুলো সহজ-সরল বাস্তবতায় বাঁধা, কিন্তু তা সমাজের গভীর অসাম্য, নির্যাতন ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। 'শনিচরী' গল্পে চা-বাগানের শ্রমজীবী নারীদের দৈনন্দিন যন্ত্রণা, মাতৃত্বের অস্বীকৃতি, এবং তাদের ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে। এই গল্পগুলো নিছক করুণ কাহিনি নয়, বরং সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও শোষণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে। সমাজে শোষকের এবং শোষিতের সংঘাত চিরকালীন। নগরায়ণের বিস্তার যত বাড়ছে, ক্ষমতার দখলদারি তত বেশি সংহত হচ্ছে, ফলে প্রান্তিক শ্রেণি আরও পিছিয়ে পড়ছে। সমালোচকের ভাষায়—

> "একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমাজবাস্তবের নগরায়ণে যতদিন উপরওয়ালারা ডমিন্যান্ট শ্রেণীরূপে বিরাজ করবে, অধীনস্থ শোষণপ্রক্রিয়ার ভেতর সাবঅলটার্ন শ্রেণীরও অবস্থান ততদিন একই ভাবে থেকে যাবে।"[১৪]

এই বক্তব্য জয়া গোয়ালার গল্পের মূল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তাঁর রচনায় শ্রেণিগত বৈষম্য এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষের ক্ষমতালিপ্সার নির্মম চিত্র উঠে আসে। 'শনিচরী' গল্পে, শ্রমিক নারীরা মালিক শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের অক্ষমতা এবং প্রতিবাদহীনতার বেদনা অনুভব করে। এই কাহিনিগুলো প্রমাণ করে যে যতদিন সমাজের উপরের স্তরের মানুষ ডমিন্যান্ট শ্রেণি হিসেবে থাকবে, ততদিন নিম্নবর্গীয়রা শোষিত হতে থাকবে শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট ও শোষণের রূপ পরিবর্তিত হবে। জয়া গোয়ালার গল্প শুধু বাস্তবতাকে তুলে ধরে না, এটি পাঠকদের সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। তার গল্পগুলি নিম্নবর্গীয় মানুষদের কষ্ট ও সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। তিনি সমাজের নৃশংস সত্যকে উপস্থাপন করলেও, তাঁর গল্প নিছক বেদনামূলক নয়

এগুলোর মধ্যে প্রতিবাদের স্পষ্ট আহ্বানও থাকে। শ্রমজীবী, নিম্নবর্গীয়, দলিত নারীদের প্রতি যে অবিচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, তার প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই তাঁর গল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই, জয়া গোয়ালার ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন, যা প্রান্তিক মানুষের স্বরকে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে এবং সমাজচেতনাকে সমৃদ্ধ করে। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতাই শোষিতদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

'জাত কুটুম' গল্পের শুরুতে ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদের জীবন প্রকৃতির অপরূপ শোভায় মোড়া, কিন্তু বাস্তবতা ঠিক ততটাই তাদের জন্য নির্মম। এখানকার আদিবাসীরা শত শত বছর ধরে এই ভূমির সন্তান, অথচ প্রতিনিয়ত তারা লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য। ত্রিপুরার নিসর্গ যতটা মনোমুগ্ধকর, ততটাই কঠিন এখানকার জীবনযাত্রা। ক্ষুধা এখানে নিত্যসঙ্গী, আর দাঙ্গার আঁচ তাদের অস্তিত্বকে করে তুলেছে আরও সংকটময়।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তখিরায়, এক আদিবাসী কিশোর, যে দাঙ্গার তাণ্ডবের কারণে বাধ্য হয়ে রাজধানীর দিকে পা বাড়ায়। তার আশা, পরিবারের জন্য কিছু একটা করতে পারবে, অন্তত ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হবে—"দৃশ্যপট ভেসে ওঠে মনের আয়নায়। রোরুদ্যমান উপোসী ভাইবোন, বেকার বাপের উদাসী চেহারা, মায়ের নীরব অশ্রুপাত, ফসলহীন জুমের রিক্ততা, শুয়োরের শূন্য খোঁয়াড়ের আধভাঙা খোলা দরজা। এর ওপর নিষ্কর্মা আর একটি পোষ্য সে। সর্বহারা বাপের উপর জলজ্যান্ত এক বোঝা"।[১৫] কিন্তু শহরে এসে সে বুঝতে পারে, এখানে তাকে দেখার দৃষ্টিই আলাদা। সন্দেহের চোখ তাকে ভীত করে তোলে। সমাজের কাছে সে শুধু এক নিম্নবর্গীয়, অখ্যাত পাহাড়ি ছেলে, যার না আছে ধন, না আছে মান।

তখি ক্লান্ত শরীরে এক দোকানের সামনে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সে জেগে ওঠে এক বিরক্তিকর আওয়াজে অবসন্ন শরীরে তখনও সে ধাতস্থ হয় নি, পরমুহূর্তে শোনে—"ইখানঅ করসকি শুনি? সর্ সর্, অইন্যখানে যা। দোকান খুলুম। যত্তসব রাস্তার কুত্তা..."।[১৬] তখনই তার সঙ্গে দেখা হয় রাসুর, যে তাকে এক হোটেলে কাজ জোগাড় করে দেয়। এখানে সে শ্রমের বিনিময়ে সামান্য আয় আর অল্প কিছু খাবার পায়। সে দেখে, তার মতো আরও অনেকে এখানে আছে—সুবল, বিষ্ণু, রাসু যারা সবাই দিনরাত খেটে খায়, অথচ কেউই প্রকৃত অর্থে শিশু কিংবা কিশোর নয়, তারা সবাই কেবল শ্রমিক।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের শরীরের গঠন, মুখাবয়ব, চালচলন মূলধারার ভারতীয়দের থেকে পৃথক। ফলে, আজও তাদের নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তখির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। নাকচ্যাপ্টা বলে অনেকে তাকে। সে শুধু একজন জনজাতি নয়, তার ওপর সে নিম্নবর্গীয়। ফলে তার চারপাশে অবহেলা ও আতঙ্কের এক অদৃশ্য দেয়াল গড়ে ওঠে। এই সময়েই ত্রিপুরায় উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছু চরমপন্থী তাকে শুধু জনজাতির অংশ হিসেবে দেখে, তাদের চোখে সে 'অন্য' একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। হোটেলেরই কিছু কর্মচারী তাকে নির্মূল করতে চায়। কারণ সে ত্রিপুরার জনজাতির প্রতিনিধি।

ত্রিপুরা বহুযুগ ধরেই বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। রাজ আমল থেকে জনজাতি ও বাঙালির সহাবস্থান চললেও সময়ের প্রবাহে এই সম্পর্ক নড়বড়ে হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু স্রোত, জমির মালিকানা প্রশ্ন এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে জনজাতিদের মধ্যে শঙ্কা বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থান, রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং সামাজিক বৈষম্য মিলিয়ে ত্রিপুরা এক ভয়াবহ সংঘাতের মুখে পড়ে। সত্তর-আশির দশকে এই দ্বন্দ্ব রক্তাক্ত রূপ নেয়। হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ, ষড়যন্ত্র—সব মিলিয়ে ত্রিপুরার

সামাজিক কাঠামো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সংঘাতের মধ্যে জনজাতির কিছু অংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দাঙ্গার আগুনে সাধারণ মানুষও পুড়তে থাকে।

তখিরায়ের গল্প আসলে ত্রিপুরারই প্রতিচ্ছবি। যে সমাজ একদিন জনজাতি ও বাঙালির সৌহার্দ্যের নিদর্শন বহন করত, সেই সমাজই তাকে 'অপর' করে তুলেছে। তথা একদিকে নিম্নবর্গীয়, অন্যদিকে জনজাতির প্রতিনিধি—এই দ্বৈত পরিচয়ই তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে গল্পের শেষভাগে দেখা যায়, মানবতার জয় হয়। রাসু, সুবল, বিষ্ণুরা তার পাশে দাঁড়ায়, কারণ তারা জানে, বিভেদের রাজনীতির শিকার হলে তারা সবাই একসঙ্গে হারিয়ে যাবে। এখানেই লেখিকা জয়া দেবীর সার্থকতা—তিনি এক কিশোরের সংগ্রামের আড়ালে সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণি ও জাতিগত দ্বন্দ্ব কীভাবে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দেয়, আবার সংকটের মাঝেও কীভাবে মানবতা আশার আলো হয়ে ওঠে।

জয়া গোয়ালার গল্পে নিম্নবর্গীয় চরিত্ররা কেবল নিপীড়িত কিংবা বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি নয়; তারা প্রতিবাদেরও প্রতীক। এই গল্পগুলো সমাজের সেই কঠিন বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে, যেখানে নিম্নবর্গীয়দের শ্রমে গড়ে ওঠা সভ্যতা তাদেরই প্রান্তে ঠেলে দেয়। তবে জয়ার সাহিত্য শুধু যন্ত্রণা বা বঞ্চনার কাহিনি নয়, এটি এক অনড় প্রতিরোধের ভাষা। তার চরিত্ররা নতজানু হয় না, বরং প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকার, টিকে থাকার, কখনো পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। পার্বতীয়া, তখি রায়ের মতো চরিত্রদের চোখে আমরা দেখতে পাই এক অসম সমাজের নির্মম বাস্তবতা, আবার একইসঙ্গে দেখি তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জেদ।

জয়ার গল্প বলার ভঙ্গি এক অনবদ্য প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে, যেখানে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে শোষণ-বঞ্চনা, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের আত্মসম্মান ও লড়াই—সবার সামনে তুলে ধরা হয়। এসব গল্প আমাদের শুধু সহানুভূতিশীল করে না, বরং এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করায়। একটা সমাজ কতটা অমানবিক হলে মানুষকে শুধুমাত্র জন্মপরিচয়ের কারণে এতখানি লাঞ্ছিত হতে হয়? এই গল্পগুলোর প্রকৃত আবেদন এখানেই। এগুলো নিম্নবর্গীয়দের কান্নার দলিল নয়, বরং তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের অনুরণন। যে লড়াই আজও চলছে, চলবে হয়তো আরও বহুকাল। কিন্তু ইতিহাস বলে, প্রতিটি লড়াইয়েরই একদিন পরিণতি আসে। এই গল্পগুলো সেই পরিবর্তনের পূর্বাভাস, যা হয়তো একদিন এক নতুন সমাজের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে, যেখানে 'নিম্নবর্গীয়' বলে আর কেউ থাকবে না থাকবে কেবল মানুষ।

তথ্যসূত্র

১. জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৯, পৃ. ১১।
২. তদেব, পৃ. ৫৫৯।
৩. তদেব, পৃ. ৫৯৮।
৪. তদেব, পৃ. ৬০৮।
৫ তদেব, পৃ. ৬০৮।
৬ তদেব, পৃ. ৬২২।
৭ তদেব, পৃ. ৬২৪।
৮ তদেব, পৃ. ৬২৫।

৯ তদেব, পৃ. ৭৩৩।
১০. তদেব, পৃ. ৭৩৫।
১১. তদেব, পৃ. ৭৩৮।
১২. তদেব, পৃ. ৭৩৯।
১৩. তদেব, পৃ. ৭৩৯।
১৪. সেনমজুমদার, জহর, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪।
১৫. জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৯, পৃ. ৭৭৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৭৭৬।

রিয়াঙ্কা দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ।

Changing Dimensions of India's National Security

Sachin Kumar Verma
Vishal Panday
Sumit Gupta

Introduction

National security in India has been increasingly threatened by the resourcefulness of terrorist outfits. The cross-border flow of terrorists, huge damage to public and private property, and the death and displacement of ordinary people are major threats to national security. In the contemporary era, globalization and technological changes have led to a change in the dimensions of national security. The partition of India in 1947, as the division among various ethnic communities, led to the establishment of two different nation-states. The 'national' idea could be defined by various means such as race, religion, territory, and the sovereignty of people. The proposition of Indians as a 'national' race was the basic tenet in pre-mutiny years.

Hypothesis of a racial issue was later replaced by the hypothesis of religion. National security is a term used to relate to the protection of an individual's integrity concerning the state's internal stability, sovereignty, and reliability. The aim is to provide a fair understanding of the changing dimensions of national security. The discussion involves the distinction between changing and non-changing dimensions of security. The main objective is to present the three broad dimensions of security : the military-related dimension, various dimensions such as economic, environmental, social, and political aspects, and the overall view based on sustainable human societies.

Keyword : National Security, Internal Security, External Security, Diplomatic Strategies, Human Security

Historical Evolution of Indian National Security

India's historical understanding of national security issues can be divided into two broad segments : ancient and modern. Ancient India had a vision of governance with a self-sufficient gram (village). Gram swaraj is based on social harmony, positive intervention in favor of the poor, and non-intervention in matters of the majority. Such self-sufficient governance structures are removed from external security threats. The early kingdoms were ruled by warrior kings who spread their authority with the help of an efficient army. Several warrior states emerged in ancient India with a caste system dividing

Verma, Sachin Kumar; Panday, Vishal ; Gupta, Sumit : Changing Dimensions of Indian National Security Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 21, No. 2, December 2024, Pages : 50-65, ISSN 2249-4332

society into various classes based on power of arms, knowledge, and income in the hierarchy of national security. The focus of these warrior states was the conquest of territories through treaties and military campaigns. The Mandala concept of power and the concept of Dharma are relevant in understanding India's foreign policy behavior and national security strategies.[1]

Following the epic battle of Kurukshetra in which millions perished, the world's first and longest treaty came into being. Religion, social justice, and the well-being of all were above the interests of class and individual, serving as the guiding principle of life. Hinduism led to the establishment of renowned centers of scholarship and influenced larger Asia, with some countries still practicing what they had learned from India. The Ganapati puja was conducted for the spiritual protection of the self; the king offered Homas, Yagas, and Yajnas to protect the kingdom from external threats. All the incorporated countries were republics following the Buddhist companion constitution and the ministry system. Buddhism allowed the natives to participate in discussions for governance and influence national security planning. Sophisticated political tools were available to guide behavior and manage conflicts. Diplomacy and statecraft were gracefully exhibited both with the local kingdoms and the other civilizations. The Ancient Charter of Human Rights allowed the active participation of women in governance, administration, and foreign relations. The ancient education system was important to convert the insipid man into confident leaders.[2]

Traditional Threats to Indian National Security

The traditional threats to national security have been a source of studied attention ever since India became free. These threats stem from two sources : they may be external or internal in origin. In a strict sense, the theory of national security is essentially concerned with analyzing these sources of danger. In this section, we shall discuss the major external and internal threats faced by India over the years. A discussion of these threats would facilitate a detailed understanding of traditional approaches to India's national security.[3]

External Threats - India has been involved in a number of military confrontations with Pakistan and China after 1947. The conduct of war or preparation for its waging presupposes certain overt or covert intentions and goals on the part of national policymakers. Moreover, victory or defeat in such armed conflicts also has direct bearings on the pursuit and fulfillment of national interests. Thus, the preparedness of the Indian state to defend the territorial integrity of the country has strategic ramifications. Besides, hostile relations with one or more of our neighbors might also lead to the formation of a hostile military alliance or coalition against India. Such an alliance of hostile powers may surround the Indian Union completely on all four sides. Intensified

efforts to eliminate internal threats to national security have to be directly correlated with the development of an appropriate defense posture to meet the external enemies of the Indian Union. Internally, India also faced and is facing new threats on linguistic and communal fronts. A fresh source of threat appeared on the horizon in 1974 in the form of militancy which demanded Khalistan or a Sikh Haryana. In a federal polity, the states or linguistic communities may have separate and immutable loyalties at variance with the national interest. From the point of view of national integrity, such loyalties are inimical. It is also generally agreed that utmost vigilance is to be observed in managing these internal problems because foreign powers hostile to India have also interests in Indian communal waters. Thus, internal and transnational overtones of separatism pose a fresh dilemma of controlling external subversion and nurturing strong democratic trust in the country. Maintenance of internal security, therefore, is a must for national security. While discussing the role of the armed forces, attention may generally be focused on external threats. However, the recognition of the new scope of traditional sources of danger to our security should contribute to an improvement of our defense preparedness, particularly in the field of internal security as well.[4]

External Threats

India faces a number of external threats that have a bearing on Indian national security. The most significant of these threats to India comes from its neighbors. China is the biggest immediate neighbor of India, and the two countries have had a series of problems emanating from historical events. On the western side, India has had wars with Pakistan, and at the time of writing, India is facing nuclear blackmail from one of the main allies of Pakistan. A number of alliances and understandings between nuclear weapon states on global and regional scales present a challenge to Indian security planners. The financing of Pakistani military capabilities and the interests of China in South Asia are important issues that have security implications for India. These countries, in combination, present an external security threat to Indian interests.[5]

The self-proclaimed status of ‘superpower’ enjoyed by the US has compounded these challenges. The superiority of the US in terms of conventional military capabilities, reinforced by nuclear superiority, has increased Indian security vulnerability. The present global power structure, in which the US is no longer checked, has undermined the credibility of international nonproliferation, which in turn has caused a security dilemma for India. The external threats to India's security emanating from its neighbors are military aggressions and attacks that will have a fair degree of probability and certain magnitude. The threat of nuclear weapons in the possession or in the process of production coming into the hands of terrorist organizations continues to pose threats to peace and security

around the world, including India. This leads terrorist organizations to be an external threat. Also, because of the defamation of the terrorists and their outfits, the intensive information warfare carried out by them and the people who support them is also an external security threat in the new environment. The coming together of these players thus necessitates India to adopt proactive diplomacy that is backed by military preparedness.[6]

Internal Threats

The threats to national security are multifaceted and cut across the political, economic, socio-cultural, and territorial dimensions. In the internal realm, there are various problems that can have repercussions for the unit-level security of the state. The most pronounced among them are issues such as separatism, ethnicity, religion, insurrections, terrorism, and criminalization. These problems involve internal subversion, as they challenge the authority of the state and encourage the people from within to establish alternate sources of power. They can be explained through social, economic, religious, political, and psychological factors, and responses to the problems can possibly be at systemic, sub-systemic, and individual levels. In the internal dimension, the classical example is provided by the ongoing separatist movement, which has the potential to destabilize the region. Similarly, the movement, which is currently active in many districts, poses a grave challenge to the prevailing governing systems in these regions. These problems are directly related to the issue of governance, as the brewing of these insurgencies indicates the inability of the state to meet the socio-economic and political requirements of the population. These developments are fueled by socio-economic disparities and deprivations in the regions. Militarization and attempts at repression in these regions make it appear that the situation is under control. The vast populations in these regions have been pushed into a confrontational mode, and it would be an unending cycle of violence and counter-violence, as all insurgencies ultimately represent a siege of governance.[7]

Emerging Threats and Challenges

1. The nature of threats has been evolving rapidly in an equally rapidly changing global situation. Newer forms and dimensions of threats have come to the forefront of national security in every nation. Large-scale planning and policy-formulating security mechanisms are meeting temporal turbulences to the chagrin of states facing these challenges. Technology and robotic systems are likely to be integrated bit by bit into all forms of weapon systems that control the conduct of contemporary warfare. These technologies have characteristics that make them easier to exploit in this broader context of hybrid warfare. Cyber threats have started raising the bar of the traditional concept of security challenges. Cybersecurity

challenges are of multiplex vulnerability ranging from espionage, including both technological espionage and criminal espionage, to simple intrusion. Along with these, there are cybersecurity inadequacies, hacks and plug-ins, cyberattacks, critical national infrastructure attacks, data breaches, cyberterrorism, and state-sponsored attacks.[8]

2. With the rise of the digital commons as the preferred method of communication, there has been a resultant explosion in the actual and potential misuse of cyberspace for stirring up violence and terrorist activities. The influence of social media in instigating terrorism, radicalization, extremism, and violence is also becoming a problem. There have also been repercussions from lone wolf and homegrown violent extremists. Terrorism and violence instigated by terrorist organizations and states are indigenous as well as extraneous.[9]

Cybersecurity Threats

Cyberspace has become an important dimension that shapes power and security. India has witnessed a significant rise in the number of cyber incidents over the past one and a half decades. This includes several notable incidents that have featured a high level of sophistication. The government and private sector entities in India have been targets of cyber adversaries because they consider operations in cyberspace a low-risk means of pursuing their own objectives. However, the digital infrastructure of India has several elements of vulnerability that make repeated and sophisticated cyber threats a concern for national security. In terms of impact, successful cyber operations can make parts of society, the civilian economy, infrastructure, and government dysfunctional, which could have a spiraling effect on national security.[10]

The Indian Ministry of External Affairs was compromised by an alleged cyber group in 2012. The website of the Indian National Security Guard was compromised in 2011 due to an email spear phishing attack. Again, in 2010, on the eve of Indian Independence Day, a major news website was hacked. India was not alone. There are reports of foreign entities having hacked the email systems of political organizations. Other targets of cyber actions include government and non-government entities in various countries. There are also reports of ongoing cyber espionage against government and corporations. The fact that developed countries are unable to eliminate attacks on cyberspace is partly because other countries and non-state actors see it as a relatively cheap and consequence-free means of aggression. This underlines the fact that states like India should not rely only on firewalls and coast after putting a successful cybersecurity defense in place. It is vital that India also enters the cyber offensive equation.[11]

Terrorism and Extremism

Terrorism and extremism. Terrorism has emerged as a major component of India's internal security challenges and increasingly remains near the top of the national security agenda. The years since India's independence have witnessed terrorism in all its violent patterns : explosions, hijackings, shootouts, and bomb blasts. The motives of terrorists are varied and wide-ranging, including demands for independence for a portion of territory, as in the case of Jammu and Kashmir, or to secure the release of jailed comrades. One often advanced reason for terrorism is that it stems from poverty, but many terrorists are well-off and hail from affluent families. An underlying consideration behind this kind of public violence is a deep and abiding belief in a set of faith-based motivations.[12]

In the main, economic deprivation appears to have become the terms and conditions precedent for extremist activities in the long run. Many young people from the minority segment are turning in favor of jihad, thus going on to be called homegrown terrorists; they are marginalized, excluded, and disillusioned with the very system they previously wanted active participation in. Early youth seems to have been radicalized mentally with a spirit of vengeance against the perceived oppressors, thereby directing their attention to create an injurious impact. There is a relationship between political and financial issues and jihad or extremism, and people complain of discrimination. We need to root out the very causes of extremism: poverty and economic disparity, the vacuum in participation, extortion, marginalization, and illiteracy in connection with them. An essential issue we need to investigate is the way in which certain countries have evolved into hotbeds for extremism. The objective of technology transfer in relation to internal security is to accentuate the forces effective enough to confront terrorists. The developing interweaving nature of terrorism has opened up numerous avenues. The pressing concern is the need to counter external terrorist threats that we are faced with due to the activities of transnational terrorist organizations. If we are to counter this kind of threat, tackling the 'real' root causes of Indian society's malaise would be most conducive. And one must acknowledge that this malaise is spread across the board, spanning both social and personal issues. Some of the factors that are bedeviling India are discussed below.[13]

Role of Technology in National Security

The latest technological advancements have had a sizeable impact on the conduct of war and the expansion of the scale of national defense security cover. The easy access to commercially available military-grade weapons, surveillance systems, underwater technology, and electronic warfare systems has made the traditional means of securing the state and its assets insufficient. The use of artificial intelligence and machine learning

has also had a major impact on the conduct of military operations. They are now being employed to improve the situational awareness of the commanders and provide actionable intelligence. In the present world, technology is advancing at such a fast pace that the regulatory mechanism to maintain a check on their uses and abuses is not able to keep pace with this rapid change. Today, because of the cyber regime, spending on the security sector is measured with the help of Gross World Product. It is difficult to say to what extent the national security systems, including national defense, have prepared themselves to face this type of challenge. However, in modern defense planning, every nation is measuring its readiness for cyber security. More and more assets of the defense services are being connected to the net to achieve shared awareness and build a force multiplier effect for homeland security. The domain of technological activities that have a close affinity to national security, considered an approximation, are, in fact, the soft power assets of the nation that provide alternative growth for the development of the nation at the international level. The endeavor for the Indians should be to attain a focal position in the changing scenario of the world, for which there is a need for a very broad policy not only for the defense services but also for other governmental departmental activities to be attractive to private investors.[14]

Military Modernization and Strategic Partnerships

This section analyzes the ongoing military modernization efforts in India and the importance of strategic partnerships in enhancing national security. It reviews the current state of India's armed forces, emphasizing the need for modernization in equipment, training, and operational capabilities.[15]

The ongoing modernization of the armed forces would require the induction of state-of-the-art subsystems and equipment, training of personnel, and restructuring of the existing force into a more lethal and efficient fighting force. The modernization has to include the establishment of systems that would bring in operational and combat efficiency. Our alliance strategy until recently has been characterized by our unwillingness to join blocks and our preference for being non-attached. The prevailing circumstances in the Indian security environment demand a tightening of strategic partnerships and a closer defense relationship with major powers. The heart of our strategy would be the emerging equation with major powers and regional countries in the extended neighborhood and beyond, who have significant stakes in the peace and stability of the Indo-Pacific region. These partnerships would help us in procurement and joint development, enhance technological and military capabilities, and provide a bulwark against belligerence.[16]

We must develop our combat capabilities, joint military strategy, and options in intra-theater and trans-theater wars. At the same time, reliance on our homegrown weapons

and war materiel would remain indispensable. The initiative in the defense sector is, therefore, central to our own military upgradation. That said, we must also develop inertia and prowess, gain capabilities, and build a technological and military-industrial base through imports and deep partnerships. A balanced and pragmatic combination of a downstream approach on one hand and wider strategic vertical and horizontal collaboration would be important for success in realizing the overarching objectives of modernization. The modernization of the armed forces assists in achieving one of the core aims of the strategic culture, which is to ensure an environment that is favorable for India to attain fundamental objectives. Any force planning and structure for meeting security challenges should aim to ensure the separation of capabilities between India and our adversaries. Evidently, the major efforts of modernization by neighboring countries have been in the field of procuring big-ticket defense items such as fighter aircraft, submarines, and main battle tanks. This leads to India's requirement for self-capability in procurement in the interest of national security and economic development.[17]

Diplomatic Strategies for National Security

Diplomacy is a preferred mode of addressing the complex conflict dynamics. While underlining its significance, it is advocated that diplomacy must be the first line of defense. This, inter alia, underlines the rationale to engage in diplomacy for securing India's broader national interests. Thus, many a time, the national security framework considers a space beyond the strategic domain of forces and war to be secured. The available analysis reasserts that foreign policy, in a positivist sense, is the actual projection of power in the international domain. As India projects its foreign policy, the essential capital for its projection needs to be the fundamentals of mutual democracy, justice, liberty, and equality, ensuring the general welfare of Indian constituents.[18]

In a post-Cold War era, the terrain is more conducive to the realization of multifarious aspirations of India in a more unequal world. India's Act-East and Look-West policy, Gujral doctrine, and, of late, Node policy to increase connectivity with neighbors through economic and political engagements and energy cooperation visits of various leaders is not only to foster good and friendly relations but also to create and contribute to the regional and global public good economy. India, in realpolitik, might not own many definitive security partnerships, but its chosen diplomacy has significantly marginalized extra-regional political actors' potent engagement and thereby its impact to catalyze conflict dynamics to the subversion of the state. Diplomatically, India has also used plurilateral and multilateral forums, starting from the United Nations to the Non-Aligned Movement, that have collectively acted to ameliorate the insecurity of India. Furthermore, the underlying significance of India's shift to multilateralism ruminates the fear of exclusion from agendas and norms that could influence its security environment.[19]

Under a realpolitik perspective, as underscored by scholars, the polity also uses cultural diplomacy and soft power as supplements to enhance national power. India's rich culture and tradition, which is non-threatening and non-malevolent in nature, is an additional factor to distinguish its power from traditional power that is sharp and stabbing. Soft power is a means in India's diplomatic tool to attract, manipulate, and impress to gain and realize its national interest. Cultural diplomacy has thus been instrumental in selling ideas on policy matters and shifting the conflict dynamics in the international arena more securely. With India being the largest democracy, cultural diplomacy reinforces the faith and confidence of countries in India as a stable and responsible friend and neighbor. Assertion and supplementation of AYUSH is not just a pharmacological experimentation but a forerunner tool of cultural diplomacy in this paradigm. Cultural symposiums, workshops, fine arts performances, and book releases about neighboring countries are many such instances that contribute to endeavoring India's positive image that is linked with the philosophy of non-intrusion in all others' internal politics.[20]

Economic Dimensions of National Security

The closeness between economic policy and national security can be seen in India's strategic planning. For instance, economic growth will improve India's security. In fact, the economy is the cornerstone on which a country's military power stands. A strong economy is also a source of military strength. In this sense, robust economic growth will replicate itself on the defense action, armamentization, and defense potential generation of a country. For developing countries, poverty and unemployment lead to unrest and internal disorder, which is a threat to social and human security. Building and developing any form of military power depends on a strong economy. The experience and example of America can be cited in this context, where its huge economy is testimony to the disaster during the last world wars.[21]

Some countries see themselves in a gray or twilight zone in which prosperity brought on by capitalism may in fact provide the main vulnerability. They can escape time and are not hurting for the benefit of the international economy. However, even if it is completely self-reliant, a government may appear to be unchallenged and in control of the greatest proportion of capabilities if other states are unable to intrude upon it. Hence, it can be speculated that an external party will first attack its economic capabilities if a potential conflict escalates. Economic independence is crucial, but it is not conceivable without engaging with the international economy. In the international community, even the nation is a unit of self-sufficiency, so it is still part of an interdependent world. Various strategic partnerships are being established with a variety of countries to bolster

India's military strength in the age of globalization. A strong intention of self-reliance has been frequently expressed in India's strategic literature. It has caused us a lot of problems in times of emergency, as we are now entirely reliant on state-created or state-owned industries. The theory of economic development, though, has led to rethinking in this direction.[22]

Environmental and Climate Change Impacts on National Security

The situation is precarious since natural disasters, whether rapid in occurring or slow, economic deprivation, and demographic shifts due to successive droughts, styles of investments and development, resource scarcity, and environmental degradation will pose non-traditional challenges to India's national security architecture. Both historically and contemporarily, environmental and ecological stress has been seen to trigger social unrest and strife, as the recently addressed assertion of the link between the siege of Megara in 402 involving Kypsilenus' insult; he called the fifty wantres who were suing for relief as environmentally induced migrants, thinking that trees could be men. The deed not only involved debt-induced migration, eyeing Tukhobuldo village in Charkha Dan block on the allurement of Rs 5,500 per acre given as grants, but also the entire family of migrants was famously based on compensation-based migration strategies for subsequent generations.[23]

Addressing Environmental Security as Integral to National Security : Progressive policies of the government in the 1960s have held India in good stead both domestically and internationally by establishing itself as a responsible democratic nuclear power, an emerging political-economic center, and a distinct member of the global community, and a resolute non-aligned middle power pursuing its own national interest. The countries' engagement to seek means to secure the environment reduces their vulnerability to transboundary environmental threats and transnational security challenges. Environmental security does not only engage with environmental pollution and degradation but also makes societies more vulnerable to poverty and insecurity. This has caused a change in the political economy of the state in an inseparable way and brings the concern of development to the national, if not human, security forefront too. Once society is gripped deeply by concerns of political economy insecurity, it cannot be anything but a security challenge as well as a national security issue - this is despite the adoption of international policy interventions inconsistent with the basic rights of the people.[24]

Social and Human Security Issues

National security encompasses different dimensions and cannot simply be reduced to traditional security, force security, or defense per se. Human life, personal freedom

from fear, and a decent quality of life are primary and fundamental to any concept of security. Insecurity felt by citizens can arise from inequality, fluid identities, low social and economic mobility, as well as uncertainty. This is conceptualized variously as social security, human security, and social justice. The growing emphasis on human rights and social justice in security and, therefore, policy making has made it essential to address other social issues and areas that were previously part of societies and not addressed in security discourses. Therefore, disparities and inequalities have worrying security implications, particularly at the national level, and communities must be mindful of social development as an integral part of the security strategy. In access to resources and development, the security dimension must identify the denials of political and social justice. The acquisition of weapons and force development cannot ensure national and regional peace unless there are measures for social development. Economic distribution, therefore, affects society. Poverty and unemployment could emerge as fuel for extremists' access, as it gives the vulnerable a cause for sub-nationalism and separatism. Ironically, one can witness the great disparity and disconnect between the prosperity caused by economic development and human development in many states. Equity within and among communities fosters an environment for peaceful living.[25]

The only way to address security for the Adivasis, Dalits, minority groups, and women is through inclusive plans that address the lopsided and exclusive social development initiatives already in place in a gradual manner. Only a holistic development plan will ensure national peace in the long run. Similarly, in a regional context, health scenarios need to be taken into national security considerations. United and stable nations ensure regional peace, and a democratic, stable, peaceful region would ensure international peace. Finally, interdependence due to global entities has forced nations to think of global security. Each country's failure is an international opportunity for pandemics-ecological and disease vulnerability. The aim is a democratic global peace, which is often misconstrued as global peace, and so free trade is seen as the way. In sum, national security is not only about strategies that ensure the survival and continuity of one's state perpetually, but also about the intellectual and social dimensions that inhibit an unfriendly attack.[26]

Role of Intelligence Agencies

Intelligence agencies have a pivotal role in Indian national security, and their role has assumed greater importance due to the emerging security challenges. Before dividing the two broader functions of intelligence, it would be useful to discuss and focus on the key intelligence agencies, which perform intelligence roles and work as sentinels for safeguarding India's security. The outer perimeter of intelligence is the Intelligence

Bureau, Directorate General of Security, Research and Analysis Wing, and State Special Branches, which act as an early warning system and have two broad functions. With the raw data that the organizations collect, the part of the organization that looks at data and manages it can be viewed as the 'information management' side. The part of the security organization that takes data, adds operational information to it, analyzes it, and attaches a judgment or forecast to it is the 'intelligence' side.[27]

One part of the successful combating of this problem, therefore, is to improve the information the organization has available by networking with governmental and private sector institutes and improving the management of this information. On the other hand, the organization must look at threats to security and reduce information to a manageable size. Much of this work can be done using computing tools, which promise to sift through vast amounts of information available in order to identify key trends and perhaps even threats. These could be seen to be on the border between the management of information side and the intelligence side. Some of these technologies may be useful in identifying threats or neutralizing them before they become personal or even localized. Intelligence agencies could use this data and 'final frame it,' but it is important that this technology does not replace the 'human factor.' Knowledge, wisdom, and creativity can never really be replaced by technological advancements.[28]

Legal and Ethical Considerations in National Security

Legal and Ethical Considerations The literature on national security talks about the relative balance between state power and individual freedoms. Measures imply a comprehensive code to protect all affected persons. As human rights norms adhere to the principle of 'universality', laws must respect the same. The crux is to ensure that while crafting national security laws, and to be precise while implementing them, the human rights of individuals are not violated unless such violation is absolutely necessary for national security needs. The state must be wary of ways to justify a wrong employing illusionary reasoning. Various judgments have drawn a fine line between upholding human rights and ensuring national security simultaneously. The marginalized status of human rights emanates from the proposition that safeguards meant for individual rights are merely 'general principles'. A cross-analysis of laws in vogue revealed that India has almost all required laws to govern the various dimensions of national security, including personal data protection, surveillance, cybersecurity, etc. The contours of these laws are based on the demand of technological and ethical needs and are believed to minimize the possibility of their utilization for extraneous considerations.[29]

Yet, all these aforementioned provisions are based on the expectation that the enforcement agencies would function flawlessly. This may not always be the case.

Rather, if such agencies want, they can find ways and means to violate the very purpose of these special laws. Ethical issues that revolve around the functioning of personnel are of greater concern. As such, crimes and corruption are also ethics-related issues. Violent crimes need law and force of investigation, while preventive corruption could be quickly checked by judicial scrutiny. Yet, the discussion at present focuses on ethical dilemmas. These exist because each domain, i.e., national security staff, also believes in numerous ethical principles that tend to guide their decision-making process. There lies an ethical dilemma on the choice of principles to rely on. In a democratic setup, especially when a country like India is home to numerous ethnic diversities and religions with relative rights, ensuring national security policy becomes even more difficult under the position of ethical theory. It is further emphasized that civil society and public ambience also influence the crafting of national security policy. Ethical principles bound by international legal obligations might ensure upholding the jus cogens. However, whichever ethical principles are given prominence by the security staff must be just and reasonable. In actual application, in that case, security issues should be dealt with scrupulously as per the law of the land that excellently represents the ethical and legal underpinnings. Democracies must make a resolute effort to integrate ethical theory with the legal rationale. It should be ensured that the security policy can withstand the ultimate check of its consistency with one another. Democratic values, as a result, will not only limit the area of recognized national security but may alter what that policy demands. Such an alignment could make the policy judicious and desirable, having bared the required legal and ethical foundations.[30]

Conclusion and Future Prospects

The national security paradigm shapes the overall thinking on security and governance in any society, state or polity. Security strategies, policies and legislations, defence preparedness, fiscal management is the product of any modifiable security paradigm which is influenced by the likes and dislikes of the society. We are passing through an era of transition and transformation ranging from military juggernaut to a range of cross border crimes and between the rise of regional dialect belts to the threat of suits. Such a state of affairs makes any overlapping of security strategies beyond national borders. National security society, technological advancement and change in the patterns of threats and challenges are a part of changing times. It is in the fitness of things in developing countries which are caught in the vortex of development. Poverty revolves and concerns for ecological, environmental, existential nature can assume dimensions of national security issues as they all impinge on the quality of life and peace. In order to survive one must have the strategies to address both the militaries, moreover technology

for war and society for whom war is to pose no problem. Thus disasters, a range of local, zonal and national conflict and self-inflicted emergencies demand a newer approach in turn to broaden the dimension of 'war' and 'warfare' in terms of comprehensive security. Any restructuring and repositioning must also involve foreign and domestic. To increase the effectiveness of the efforts and strategy formulation it is important that academia and policy come closer in the years to come, both for a better understanding of the security scenario and to make our strategy effective because the future is closely associated with technology.

References :

1. Gandhi, A., Adhvaryu, K., Poria, S., Cambria, E., & Hussain, A. (2023). Multimodal sentiment analysis : A systematic review of history, datasets, multimodal fusion methods, applications, challenges and future directions. Information Fusion.sentic.net
2. Rangarajan, S. (2022). Changing Dimensions of Security : An Indian Perspective. In The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs (pp. 114-122). Cham : Springer International Publishing. [HTML]
3. Basrur, R. (2023). THE SHADOW OF THE CONVENTIONAL PAST : INDIA'S NUCLEAR TENSIONS WITH CHINA AND PAKISTAN. Journal of International Affairs. [HTML]
4. LIMA, M. (2023). Strategic Competition and Self-Reliance: Analyzing Munitions Industrial Bases in India and Pakistan amid Great-Power Rivalry..Journal of Indo-Pacific Affairs. [HTML]
5. Agnihotri, K. K. (2022). Holistic maritime security challenges facing India : Mitigation imperatives and options. National Maritime Foundation.maritimeindia.org
6. Rahman, Z. U., Khan, A., Lifang, W., & Hussain, I. (2021). The geopolitics of the CPEC and Indian Ocean : security implication for India. Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, 13(2), 122-145. researchgate.net
7. Uddin, M., Manickam, S., Ullah, H., Obaidat, M., & Dandoush, A. (2023). Unveiling the metaverse : Exploring emerging trends, multifaceted perspectives, and future challenges. IEEE Access, 11, 87087-87103. ieee.org
8. Kodakandla, N. (2024). Securing Cloud-Native Infrastructure with Zero Trust Architecture. Journal of Current Science and Research Review.jcsrr.org
9. Noori, N., Sayes, A., & Anwari, G. (2023). The Negative Impact of Social Media on Youth's Social Lives. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 3(1).ijhess.com
10. Mishra, A., Alzoubi, Y. I., Anwar, M. J., & Gill, A. Q. (2022). Attributes impacting cybersecurity policy development: An evidence from seven nations. Computers

& Security.sciencedirect.com
11. Naha, A. (2022). Emerging cyber security threats: India's concerns and options. International Journal of Politics and Security.dergipark.org.tr
12. Aras, F. & Kandemir, E. (2023).An Evaluation of India's Central Asian Policy in the Context of Regional Interests.Bilig.dergipark.org.tr
13. Yusuf, A. (2024). The UMMAH Project : A Comprehensive P/CVE Framework for Countering Violent Extremism in Nigeria. The UMMAH Project : A Comprehensive P/CVE Framework for Countering Violent Extremism in Nigeria (October 01, 2024).ssrn.com/
14. Bondarenko, S., Bratko, A., Antonov, V., Kolisnichenko, R., Hubanov, O., & Mysyk, A. (2022). Improving the state system of strategic planning of national security in the context of informatization of society. Journal of Information Technology Management, 14 (Special Issue: Digitalization of Socio-Economic Processes), 1-24. ut.ac.ir
15. Rosa, A. (2024). Innovative technologies of rail transport used by the Armed Forces of the Republic of Poland.SystemyLogistyczneWojsk.icm.edu.pl
16. Rosa, A. (2024). Innovative technologies of rail transport used by the Armed Forces of the Republic of Poland.SystemyLogistyczneWojsk.icm.edu.pl
17. Singh, S., Ghosh, K., & Maji, P. K. (2024). Advance Packaging for Safety and Security of Agricultural Produce in Supply Chain. In Novel Packaging Systems for Fruits and Vegetables (pp. 289-318). Apple Academic Press.[HTML]
18. Sullivan de Estrada, K. (2023). India and order transition in the Indo-Pacific: resisting the Quad as a 'security community'. The Pacific Review.tandfonline.com
19. Pandit, S. D. (2024). Transformation of India's Foreign Policy: Shaping the Global Order as a Responsible Power. [HTML]
20. Cooper, A. F. (2021). China, India and the pattern of G20/BRICS engagement : differentiated ambivalence between 'rising' power status and solidarity with the Global South. Third World Quarterly.[HTML]
21. Shahbaz, M., Sharma, R., Sinha, A., & Jiao, Z. (2021). Analyzing nonlinear impact of economic growth drivers on CO_2 emissions : Designing an SDG framework for India. Energy Policy.uni-muenchen.de
22. Sharma, R., Nanda, M., Fronterre, C., Sewagudde, P., Ssentongo, A. E., Yenney, K., ...& S sentongo, P. (2022). Mapping cancer in Africa: a comprehensive and comparable characterization of 34 cancer types using estimates from GLOBOCAN 2020. Frontiers in public health, 10, 839835.frontiersin.org
23. Kumar, R. (2023). Navigating Non-Traditional Security Threats in the Western Indian Ocean Region. Journal of Defence Studies.idsa.in
24. Nguyen, T. T., Grote, U., Neubacher, F., Do, M. H., & Paudel, G. P. (2023). Security risks from climate change and environmental degradation: Implications for

sustainable land use transformation in the Global South. Current Opinion in Environmental Sustainability, 63, 101322.sciencedirect.com
25. Oberg, C., Hodges, H. R., Gander, S., Nathawad, R., & Cutts, D. (2022). The impact of COVID-19 on children's lives in the United States : Amplified inequities and a just path to recovery. Current problems in pediatric and adolescent health care, 52(7), 101181.sciencedirect.com
26. Bottiani, J. H., Camacho, D. A., Lindstrom Johnson, S., & Bradshaw, C. P. (2021). Annual research review: youth firearm violence disparities in the United States and implications for prevention. Journal of child psychology and psychiatry, 62(5), 563-579.nih.gov
27. Chatterjee, S., Khorana, S., &Kizgin, H. (2022). Harnessing the potential of artificial intelligence to foster citizens' satisfaction: An empirical study on India. Government information quarterly.bournemouth.ac.uk
28. Hasan, M. K., Ghazal, T. M., Saeed, R. A., Pandey, B., Gohel, H., Eshmawi, A. A., ...& Alkhassawneh, H. M. (2022). A review on security threats, vulnerabilities, and counter measures of 5G enabled Internet?of?Medical?Things. IET communications, 16(5), 421-432.wiley.com
29. Mukherjee, M., Abhinay, K., Rahman, M. M., Yangdhen, S., Sen, S., Adhikari, B. R., ...& Shaw, R. (2023). Extent and evaluation of critical infrastructure, the status of resilience and its future dimensions in South Asia.Progress in Disaster Science, 17, 100275.sciencedirect.com
30. Chawla, N. & Kumar, B. (2022). E-commerce and consumer protection in India : the emerging trend. Journal of Business Ethics.springer.com

---

Sachin Kumar Verma,
Research Scholar, Department of Defence & Strategic Studies
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

Vishal Pnaday
Research Scholar, Department of Defence & Strategic Studies
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

Sumit Gupta
Research Scholar, Department of Defence & Strategic Studies
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

Use of Artificial Intelligence in the Accounting Profession

Supriyo Kumar Saha

Abstract :
In today's context, artificial intelligence (AI) has evolved into a pervasive term, extending beyond diverse fields of expertise. Its integration into the accounting domain is no exception. AI is playing a pivotal role in accounting, initially by automating laborious tasks to enhance efficiency and precision. This utilization of AI not only streamlines operations but also unleashes the potential for accomplishing more with available resources. Accountants leverage AI to automate administrative tasks, liberating valuable time for in-depth data analysis and interpretation. There are three primary domains where AI proves instrumental in advancing the accounting profession. The foremost application of AI lies in invisible accounting, where the automatic management of data collection, organization, and presentation is orchestrated by AI. Another crucial realm where AI significantly benefits the accounting field is continuous auditing. AI expedites data reviews, swiftly identifying duplicate invoices and ensuring accurate expense categorization. This facilitates continuous audits, fostering enhanced financial protection and control, thereby building trust. The third sphere where AI contributes to the accounting profession is by providing insights for informed decision-making. AI aids in business decision-making by deriving actionable insights from historical transactional data and external factors. This article delves into the practical implementation of AI in the aforementioned areas, offering concrete examples to illustrate its applications in the field of accounting.Despite the chain of wide-ranging effects brought on by the advent of AI, it would be erroneous to proclaim it as a Deus ex machina, or "god of the machines" since the field of AI is yet to undego developments that successfully mirror the nuanced capabilities of human intelligence. The humanity of intelligence is not something that can be easily replaced. (Aryal, 2022)

Keywords : Artificial intelligence, Audit, Digitalization, Human Intelligence

INTRODUCTION :

By the close of the 20th century, the realm of science fiction had already acquainted itself with artificially intelligent robots. In 2011, a pivotal moment emerged as society started grasping the capabilities of AI and its enormous potential. IBM's AI-driven creation, Watson, took center stage on Jeopardy, a popular TV quiz show. Crafted

specifically for a three-night Jeopardy competition, Watson was equipped with "DeepQA," a software program capable of querying 200 million pages of information. Watson achieved a notable victory over two of Jeopardy's most accomplished contestants, Ken Jennings and Brad Rutter (Best, 2017). Best suggests that Watson's triumph, rooted in its capacity to retain extensive data, prompted contemplation about the possibility of AI surpassing human intelligence. In 2013, Frey and Osborne released their study, "The Future of Jobs," which examined how susceptible American jobs are to computerization. Utilizing O*NET, the U.S. Department of Labor's online data repository, they categorized occupations based on knowledge, skills, and abilities, estimating the likelihood of computerization for 702 detailed occupations (Frey & Osborne, 2013). Accounting jobs received a risk index of 0.94, categorizing them as "risky." This research cited over 9,300 times on Science Direct alone, gained widespread attention from media outlets (New York Times-2017, Economist-2018) and major accounting firms (PwC-2018, Deloitte-2017), fostering concerns that AI could replace accountants.

AI holds immense potential not only in computing but also in accounting. Its speed in processing information, recalling data, automating tasks, and summarizing large datasets is invaluable to businesses. This has led to increased adoption by accountants for decision-making, transaction documentation, tedious task automation, and fraud detection. Despite these advantages, there are associated risks, particularly as AI takes on an independent decision-making role. Major risks include the absence of regulations and compliance standards, threats to human creativity, and the potential for human bias in AI.

In exploring the merits and pitfalls of AI, this article aims to highlight the parallels and distinctions between AI and human intelligence. Additionally, it seeks to trace the historical trajectory of AI to comprehend its implications for the future of accounting. Furthermore, an examination of various texts will be undertaken to envision the potential landscape of accounting in a workplace dominated by AI.

Contextual information regarding Intelligence, Artificial Intelligence, and the application of AI in the field of accounting :

Perceptions of intelligence differ from Individual to Individual. As per the Merriam-Webster Dictionary (2021), intelligence is characterized as "the capability to employ knowledge to manipulate one's surroundings or to engage in abstract thinking, as assessed by objective criteria." Some view intelligence as the aptitude to solve problems and excel in assessments like an IQ test, while others define it in terms of decision making capabilities. Over the years, numerous definitions of intelligence have emerged.

Harvard psychologist Howard Gardner proposed "The Theory of Multiple Intelligences" in 1994, categorizing intelligence into eight types : verbal-linguistic, logical-mathematical, visual-spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, and naturalist.

Gardner expanded this theory in 2011 to include existential intelligence, challenging the traditional notion of a single cognitive-focused intelligence. He argued that the emphasis on logical-mathematical abilities in schools and society does not represent the full spectrum of human intelligence.

Within the realm of Artificial Intelligence (AI), Professor B.J. Copeland delineates it as "the capacity of a digital computer or computer-controlled robot to execute tasks typically linked with intelligent entities." Moudud-Ul-Huq (2014) explains that AI encompasses various algorithms, models, and techniques derived from statistics, machine learning, databases, and visualization. Before AI, computers were limited to solving pattern-based problems and couldn't make independent decisions. AI, however, enables computers to deduce logical and mathematical conclusions independently, learning from data patterns and continually expanding expertise.

AI's history dates back to 1950 when Alan Turing published a paper on building intelligent machines. By 1956, researchers were collaborating on AI's future, and Joseph Weinbaum created the first chat program, "ELIZA," at MIT. This early AI demonstrated conversational capabilities as sophisticated as human interactions.

AI's contemporary applications are widespread, influencing decision-making in various sectors, including business and daily life. Security cameras use AI to identify individuals in homes and businesses, streaming services like Netflix utilize AI for personalized watchlists, and AI aids in vaccine development, as seen in the response to COVID-19.

In the field of accounting, AI's history can be traced to 1986, with extensive research on its applications in auditing, taxation, financial accounting, management accounting, and personal financial planning. Expert systems (ESs) are a popular example of artificial intelligence (AI) in accounting that mimic human competence. They are used to tackle tasks like massive data analysis and month-end closing. The growth of AI in accounting is attributed to its ability to solve mundane tasks efficiently.

Benefits of AI in accounting :

Ernst and Young [EY] (2018), a prominent accounting and advisory firm, noted that organizations embracing AI at the enterprise level enhance operational efficiency, facilitate quicker and more informed decision-making, and foster innovation in new products and services. This recognition of AI's potential has prompted substantial investments in AI technological developments by businesses globally. The projected annual growth for the AI market, encompassing software, hardware, and services, is estimated at 16.4%, reaching $327.5 billion in 2021 (Shirer, 2021).

Speed is a paramount advantage of integrating AI into accounting. The remarkable speed of Watson demonstrated in its victory over Jeopardy champions, underscores the edge of computers in swiftly retrieving data compared to the human brain. While

human cognitive abilities excel in higher-level thinking and analysis, computers, designed for rapid and accurate information processing, outpace humans in processing time. This processing speed, exemplified by microprocessors in 2015 operating at 2 GHz compared to the human mind at 200 Hz (Urban, 2015), significantly benefits accounting firms. Workflow automation software, particularly technologies like robotic process automation (RPA), accelerates the month-end closing process, minimizing errors and enhancing efficiency (Brands, 2016). RPA eliminates manual, error-prone tasks, enabling organizations to achieve efficiency and accuracy improvements at a reduced cost, allowing accountants to concentrate on tasks aligned with human cognitive capacities, such as formulating strategies and analyzing results produced by AI.

AI also facilitates effective summarization of accounting data, especially in auditing processes dealing with extensive financial and non-financial datasets. Cognitive technologies, a subset of AI, aid auditors in sifting through large volumes of data for accurate decision-making. Automation in auditing includes robotic counting, physical analytics, and predictive analytics (Kokina & Davenport, 2017). Researchers emphasize the use of AI technology to enhance accountants' ability to process information from large datasets, as working with such data sets without technical assistance can lead to increased ambiguity, misidentification, and suboptimal audit decisions (Issa et al., 2016).

The adoption of AI in accounting also streamlines laborious and repetitive tasks, leading to notable efficiencies in the workplace. AI excels in handling monotonous tasks, dealing with highvolumes of repetitive work, and providing analytics for decisionmaking based on large datasets. Enabled by computer-assisted audit tools and techniques (CAATT) software, accounting automation empowers auditors to perform testing at rates that were previously unprecedented (Accountants, 2018). Shifting the responsibility of monotonous tasks from humans to computers enables the human workforce to contribute more to tasks requiring critical thinking. Successful implementations of AI in prominent accounting firms, such as Deloitte's "Argus" machine learning software and PwC's "Halo" system, demonstrate the effectiveness of AI in trend analysis, term identification in contracts, and identification of problematic journal entries, enhancing efficiency and reducing repetitive labor (Dickey et al., 2019).

AI's impact on fraud detection is noteworthy, particularly in response to legislative measures like the Sarbanes-Oxley (SOX) Act of 2002. AI applications, such as machine-learning algorithms, have proven effective in identifying credit and insurance fraud, uncovering accrual manipulation, and detecting unusual fraudulent activities like discretionary accruals and unexpected growth in employee productivity (Frederick and Schwartz, 2014; Rahul et al., 2018; Stancheva, 2018). AI's ability to recognize inconsistent data contributes to efficient fraud detection (Nickerson, 2019).

Beyond specific tasks, AI enhances overall productivity by eliminating menial tasks, allowing a focus on cognitive tasks and tacit judgments. At both micro and macroeconomic

levels, AI induces productivity growth, reducing labor costs, increasing throughput and quality, and decreasing downtime. The expected annual improvement in productivity ranges from 0.8% to 1.4%, translating to a 15% growth over a decade linked to AI (McKinsey Global Institute, 2017). While concerns about job displacement may arise, cognitive AI is predominantly used to enhance productivity in tasks traditionally performed by machines, thus contributing to overall efficiency and growth (Wheaton & Nguyen, 2018).

Challenges linked to AI :

Despite the advantages AI brings to the accounting profession, there are many challenges associated with the implementation of AI. One primary concern is related to business ethics and compliance, as a firm's reputation heavily relies on adherence to regulations and ethical practices. The deployment of AI in job functions poses potential problems, as the technology's ability to draw conclusions may lead to unfavorable decisions if not properly supervised by human judgment. Malfunctions in the AI code resulting in unethical decisions could have catastrophic consequences, especially if programmers lack proper training or if the AI is acquired from third parties. The lack of regulation and compliance standards regarding AI usage by the government further amplifies these risks, providing businesses with a high degree of freedom in AI applications. This regulatory gap, reminiscent of the Enron and Wall Street crises, reflects the challenge of establishing standards for a rapidly developing and diverse field like AI.

Insufficient research and trust in AI's integration into the workplace for various tasks present another risk. AI's reliance on repetition may render it unreliable or faulty in complex or unique circumstances. The widespread use of AI in accounting, while promising, introduces unforeseen circumstances, and the risks associated with AI, particularly ethical concerns and threats to human creativity, are expected to intensify as the technology advances further.

The cost during the installation phase is an additional risk associated with AI. Initial installation of AI typically incurs high costs, with estimates reaching up to $300,000 for AI software, whether acquired from a third party or custom-developed. Factors influencing AI software costs include the scope of the system required, its features, and management. Integrating a technology that is not fully understood or developed poses a significant opportunity cost, adding to the overall risk of AI implementation (Web_FX, 2021).

Benefits and drawbacks of AI :

The world has undergone significant employment shifts throughout history due to technological advancements. Accounting, as a crucial element of rapidly evolving businesses, has consistently adapted to new technologies to enhance accuracy, optimize efficiency,

and better serve clients. Some tasks in accounting, due to their time-consuming and monotonous nature, may lack appeal for professionals. The skills required for accounting professionals evolve over time, and as technology changes, so do the roles of accountants.

Throughout history, accountants have adapted to advancements in technology, from the invention of bookkeeping in the 15th century to the introduction of computers in the 1900s and the rise of automation and processing through software like VisiCalc in 1978. As AI becomes more prevalent, certain fields within accounting now require minimal human interference. The market size of accounting services has grown significantly, reaching $119.5 billion in 2021. While big firms leverage AI for monotonous tasks, its application is limited to highly repetitive functions.

AI undeniably provides immense value in driving sales and boosting revenue and profits. Once integrated into systems, AI increases productivity more significantly than previous technologies. However, the substantial costs of AI pose financial challenges for businesses, leading to careful consideration before investment. Deloitte University's framework evaluates an investment's viability, value, and vitality.

In the realm of data management and analytical decision-making, accounting requires advanced tools. AI-powered data analytics tools enable efficient processing and analysis of large datasets, enhancing decision-making processes. Although businesses leverage AI to aid accountants, they remain cautious about its independent decision-making capabilities. Despite AI's benefits, risks and limitations persist, prompting companies to use AI as a support system under human supervision rather than as autonomous decision-makers in the accounting profession.

Stein (2017) highlights that future accountants will need essential skills such as mining structured and unstructured data from diverse sources, identifying potential data risks and issues, and applying data analytics to transform raw data into valuable insights. A solid understanding of how AI functions can give accountants a competitive advantage in mastering data analysis, leading to an enhanced comprehension of financial statements. Effective data interpretation will require future accountants to emphasize visualization and analytics. Moreover, in the era of AI, communication skills and critical thinking will play an increasingly crucial role (ICAEW, 2018).The competencies of accountants in machine learning and data analytics will be particularly valuable. They can offer support to other employees by aiding in the understanding of complex models and extracting meaningful insights from data (ICAEW 2017).

Gamage (2016) emphasizes that future accountants will extend beyond the role of mere preparers of financial data. In an era dominated by AI, the profound numeracy and data analytical skills possessed by accountants will be exceptionally crucial. This sentiment is reinforced by her assertion that proficiency in data analytics and financial modeling will empower accountants to assume more proactive roles within their organizations. As accounting becomes increasingly intertwined with technology, technical literacy

will be indispensable for accountants. Professionals in accounting must also acquire proficiency in utilizing data visualization strategies and programs to translate vast datasets into meaningful insights for clients and organizational leaders. Entry-level accountants need to assess their roles and adaptability to upcoming technological changes, as automation is likely to replace many transaction processing and data entry responsibilities (Brands, 2016). To prepare for an AI-driven workplace, aspiring accountants should explore various avenues. While job training is typically provided during onboarding, it is crucial for students to encounter AI as part of their formal education before entering the workforce. As certain accounting processes become automated, accountants must grasp the language underlying these programs and the information they can extract. This knowledge will enable collaboration between accountants and programmers to scrutinize code and ensure the absence of human biases.

Financial reporting and revenue forecasting stand out as two accounting functions poised for significant evolution through the integration of AI. Despite the current application of computerized models and advanced techniques, forecasting remains challenging due to its inherent uncertainty, asymmetry, and risk (Stancheva, 2018). The implementation of predictive models by AI has the potential to enhance the accuracy and quality of financial forecasting-an integral component of budgeting and strategic management for companies. It is noteworthy that as far back as the 1980s and 1990s, certain expert systems were employed, primarily for tasks such as cash flow evaluation and the analysis of business combinations, the accounting treatment for leases and the analysis of financial reports for regulatory purposes (Yang & Vasarhelyi, 1995). As AI continues to advance, financial reporting and forecasting are expected to undergo more significant transformations. For instance, in corporate reporting, AI has the capability to extract information from the company's public statements, enabling fraud analytics and in-depth analysis of balance sheets and performance (Boillet, 2020). These developments underscore the ongoing impact of AI on the evolution of accounting functions.

Imparting training to Accountants :

AI is not only influencing the roles within the accounting profession but is also shaping the job prospects for accountants. Recognizing the evolving landscape, many universities have adapted their accounting degree curriculum to align with employer expectations for graduating accounting majors. Anticipating a greater reliance on AI in the coming decade, companies are exploring AI solutions to automate time-consuming tasks. A survey by Sage (2018) revealed that 66% of accountants expressed interest in investing in AI solutions, while 55% planned to leverage AI to enhance their business functionality. Consequently, employers are showing a preference for entry-level candidates with a background in technology.

This trend has prompted adjustments in university curricula across the United States.

Accounting programs are progressively integrating technology into coursework, with many students now required to learn about data analytics, AI, and other emerging technologies (Meyer, 2019). Possessing an understanding of the codes used in accounting software is particularly advantageous for accounting graduates. In scenarios like the enactment of new tax laws or the release of auditing standards, accountants can collaborate with programmers to develop and modify software programs as needed. This involvement in the coding process not only reduces the risk of unethical practices but also mitigates the potential for human bias in the code.

Large accounting firms, similar to universities, are acknowledging the significance of integrating AI into their employee training programs. According to Meyer (2019), KPMG, one of the Big Four accounting firms, is collaborating with USC and eight other universities across the country. This collaboration aims to merge traditional book-keeping and auditing courses with practical applications of technology, advanced data analytics, and real-world scenarios. The integration of technology into degree programs is identified as a key factor driving the growth of job prospects for accountants.

As students increasingly focus on technology, they are developing valuable skills that are highly sought after. The incorporation of emerging technologies, including AI, allows accountants to leverage their time for higher-level decision-making, adding value to their roles. Deloitte's recent report emphasizes that technological advancements historically create and eliminate jobs, a trend expected to continue with the widespread use of AI in the workplace (Deloitte, 2017). Accountants equipped with technical skills can transition into more of a "business-enhancement" role, utilizing their improved data management skills to interpret AI software outputs.

Moreover, the report underscores the enduring importance of soft skills for accountants. Gustein and Sviokla (2018) observe that skills such as communication, context and content comprehension, emotional competency, teaching ability, ethical awareness, and networking are beyond the current and foreseeable capabilities of AI. Strengthening these soft skills positions accountants to excel in areas where AI may fall short.

The cognitive abilities of Accountants :

Analyzing the benefits AI brings to an organization and anticipating potential future changes raises questions about the impact of AI on human jobs. However, delving into Howard Gardner's theory of multiple intelligences prompts doubts about the true intelligence of AI. While AI delivers advantages such as faster processing times, increased productivity, and simplified data analysis, these aspects primarily align with logical and mathematical intelligence, which is pertinent to the responsibilities of an accountant. Nevertheless, Gardner's theory emphasizes the significance of other types of intelligence, such as verbal-linguistic and interpersonal intelligence, which may be equally or even more crucial in the accounting profession.

Interpersonal intelligence, characterized by the ability to build and manage relationships effectively, plays a pivotal role in understanding and meeting the needs of clients. Accountants benefit from interpersonal intelligence by fostering strong client relationships, having commercial awareness of financial trends, and persuading clients to make ethically sound decisions, even if they don't result in maximum financial gains (Gardner, 2011). Verbal-linguistic intelligence, encompassing problem-solving and communication skills, is essential in the complex and client-oriented field of accounting. The ability to interpret and explain laws, written documents, and persuade others is vital for success in this profession.

Moreover, the current and developing AI software in accounting primarily falls under the category of narrow AI-systems proficient at executing specific tasks or a limited set of tasks on their own (Vetter, 2021). As mentioned by Dickson (2020), narrow AI excels in a single task and struggles when faced with situations beyond its defined scope. These narrow AI systems in accounting also lack the capacity to transfer knowledge from one field to another, diminishing the feasibility of standalone AI systems in the accounting domain.

Munoko et al. (2020) highlight that despite the significant benefits and uses of AI in the accounting profession, there have been unintended and unethical consequences. Similarly, Kokina and Davenport, in their 2017 report titled "The Emergence of Artificial Intelligence : How Automation is Changing Auditing," concluded that the limited use of AI in accounting is due to a lack of AI training within the field.(Kokina, J., Davenport T.H, 2017) Automating numerous accounting tasks could lead to ethical issues and render AI unsuitable for business applications. This is linked to the recognition that while some accounting tasks can be automated, fully automating crucial tasks may create challenges for businesses.

Munoko et al. (2020) found that automating auditing tasks creates expectation gaps and a responsibility gap within the firm. Instances of corporations attempting to automate accounting tasks and facing failures have also been observed. Although AI can assist in accounting decisions, the decisions made by AI should undergo analysis by humans due to the ethical risks associated with AI (Omoteso, 2012). Regarding the question of whether to integrate AI or be apprehensive about it, CPA Canada (2019) notes that AI will not replace CPAs if CPAs embrace AI and leverage the opportunities it presents. Importantly, automating routine tasks will provide humans with time to address different issues, benefiting both business and the accounting profession.

Literature Review :

To envision the potential future of accounting with the integration of AI, I delved into various sources. The research conducted by Baldwin et al. (2006) posits that accounting tasks exhibit a diverse nature, encompassing structured, semi-structured, and unstructured

decisions. Due to the inherent risk associated with tax and auditing decisions, coupled with the dynamic nature of laws and regulations, relying solely on AI is deemed inadequate for formulating accounting decisions. Baldwin et al. further contend that the insufficient cross-disciplinary research collaboration between accounting and computer science has resulted in the absence of a reliable AI service for accounting in the business realm. This dearth of trustworthiness in AI for accounting may pose challenges in automating certain accounting jobs, despite the prevalence of AI systems in other industries.

Stewart et al. (2015) also adopt an optimistic perspective in their work, "Technology and People: The Great Job-Creating Machine." Through an analysis of UK census records spanning every decade since 1871 and labor force survey data from 1992, the researchers paint a positive picture. Their findings indicate that technological innovations, including AI, have emerged as significant substitutes for both cognitive and manual routine jobs, such as those held by bank and post office clerks. Interestingly, they observe a contrasting trend in non-routine and dynamic occupations, such as business analysts, consultants, and care workers, which have experienced increased demand due to innovations in technology that support these roles. Stewart et al. describe an indirect mechanism leading to both employment expansion and increased productivity in specific sectors. They predict that the rapid evolution of technology will necessitate higher education levels and continuous re-training for accountants. These challenges are anticipated to play a central role in shaping new government policies that generate fresh job opportunities. Notably, in 2021, Congress introduced a bill recognizing accounting as part of STEM education in schools (Congress.gov, 2021). Stewart et al.'s research underscores the notion that AI development has liberated individuals from mundane tasks, giving rise to more meaningful and innovative employment opportunities.

The McKinsey Global Institute's 2017 report, titled "A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity," offers an in-depth exploration of the impact of automation on labor. Unlike other analyses, this report concentrates on specific work activities rather than entire occupations. According to the report, less than five percent of presently paid work activities are fully susceptible to automation. Notably, major accounting tasks such as interfacing with stakeholders, managing and developing people, applying expertise to decision-making, and planning are identified as activities minimally prone to automation. These tasks demand human intelligence, specifically verbal-linguistic and interpersonal intelligence, which AI lacks. The report also delves into factors influencing the pace and extent of AI automation, emphasizing that technical feasibility, development and deployment costs, labor market dynamics, and regulatory and social acceptance of AI play crucial roles in determining the practicality of automation. Similar to the findings of Stewart et al. and Baldwin et al., McKinsey's report maintains a positive perspective. It concludes that while accounting tasks may appear automatable on paper, real-world implementation poses significant risks.

The ICAEW's (2018) report on "IT Faculty Study on AI and the Future of Accountancy" explores the specific aspects of accounting that could be optimally automated. Notably, bookkeeping, being a highly routine and time-consuming facet of accounting, stands out as particularly susceptible to automation. ICAEW argues that AI technologies can fully automate bookkeeping, especially in large organizations, where the manual task of recording debit and credit transactions has largely been automated. Additionally, the report highlights fraud prevention and detection as another task where AI application is both desirable and feasible. Unlike humans, machines lack temptations for money or power, and AI operates based on pre-established rules and patterns. The use of AI in fraud prevention can mitigate risks such as theft, tax avoidance, and larceny that may persist when relying solely on human capital.

AI has demonstrated a significantly higher success rate in detecting criminal activities compared to conventional transaction monitoring systems. Upon identifying potentially fraudulent activities, AI can flag these for examination by human experts. ICAEW concludes that aspects of accounting beyond bookkeeping and fraud reporting are neither desirable nor likely to be automated.

Conclusion :

The technological advancements introduced by AI in the accounting profession are enhancing the value of accountants' roles. Upon analyzing the myriad benefits AI offers in accounting, a consistent pattern emerges: AI serves as an advanced tool, replacing outdated technologies rather than human workers. In instances where AI does replace labor, it typically takes over routine tasks like bookkeeping and data entry. While AI proves to be a valuable assistant, its benefits must be carefully monitored due to significant associated risks. Leveraging AI to swiftly analyze extensive datasets and make informed decisions based on generated reports will be indispensable for businesses. The advantages, including accelerated transaction processing, heightened productivity, potential automation of mundane tasks, such as bookkeeping and data entry, streamlining the month-end close process, and improved data analysis, outweigh the risks tied to the absence of government regulations, employee apprehension about job displacement by AI, and ethical concerns related to AI. Implementing government regulations to govern the development, use, and control of AI is a crucial step toward mitigating associated risks. It is essential to acknowledge that AI, on its own, is not advanced enough to make independent decisions but serves as an excellent assistant in data management.

Likewise, a wealth of research underscores the notion that, barring a few exceptions, the diversity and intricacy of accounting tasks render them unsuitable for full automation (Baldwin et al., 2006; ICAEW, 2017; McKinsey, 2017; Omoteso, 2012; Stewart et al., 2015). In the future, AI is expected to play a significant role in accounting, but careful

consideration of associated risks is paramount. Ethical concerns arising from AI making independent decisions pose a risk, yet this risk can be effectively mitigated through regulation and oversight. Examining these risks reveals that for AI to be seamlessly integrated or even utilized in business operations, human supervision is indispensable. The level of intelligence AI possesses is insufficient to sustain a workplace without the complementary input of human intelligence.

The research conducted by Frey and Osborne (2013), which categorizes the accounting profession as high-risk, deviates from other academic perspectives but carries significant citation impact. While the benefits of utilizing AI in accounting primarily pertain to routine tasks, the associated risks are concentrated in critical areas such as decision-making and ethics. Contrary to the somewhat pessimistic outlook presented by Frey and Osborne, Gustein and Sviokla (2018) emphasize that understanding the context, business model, and competition of a business remains challenging for even the most advanced AI. They underscore the fact that AI lacks an ethical compass, underscoring the importance of a workforce with strong moral values. If future entry-level workers focus on developing skills that resist automation, AI will likely continue to serve as an assistant to accountants rather than replacing them. The ongoing evolution prompted by AI will reshape the accounting profession, with accountants shifting their focus toward consulting and advisory roles over routine tasks. Failure to adapt to these dynamic changes may have adverse consequences for individuals and society at large. To thrive in this evolving landscape, accountants must cultivate technical skills, collaborate with programmers, apply data analytics, and identify potential data risks.

The high demand for skills such as collaboration with programmers, data analytics, and the identification of potential data risks in an AI-driven world will contribute to the expansion of the job market for accountants. Shifting from routine tasks to more decision -driven responsibilities will also enhance accountants' job skills. While the advancement of AI may result in the elimination of some jobs, it will simultaneously create new opportunities for accountants. Soft skills like emotional competence will become increasingly important for accountants to navigate the direct and indirect impacts of AI in workplaces. Overall, the profession of accountancy stands to benefit positively from the integration of Artificial Intelligence, aligning with the historical trend of accounting evolving in response to technological advancements rather than remaining static.

The impact of AI extends beyond the accounting profession, raising concerns among workers, particularly those in the 18 to 24 age group, with 37% expressing worries about technology eliminating their jobs (Douglas, 2019). However, historical patterns, as highlighted by McKinsey (2018), demonstrate that technology has consistently generated new job opportunities to replace those rendered obsolete. AI has been designed to handle tasks perceived as tedious or beyond human capability, such as the month-end closing process and the analysis of large datasets. Yet, AI remains fundamentally distinct from

human intelligence, incapable of truly emulating the innate human aspects that define intelligence. Despite impressive achievements, such as Watson winning Jeopardy, AI's abilities often boil down to tasks like memorization, lacking the depth and complexity inherent in human intelligence. In essence, the unique qualities of human intelligence, encompassing emotional, creative, and contextual understanding, remain unparalleled by AI.Indeed, the expectations from an average person were never centered around becoming a data collection or analytical hub; machines were specifically designed for tasks surpassing human cognitive capabilities. The ability to reproduce vast amounts of memorized information doesn't constitute genuine intelligence. Furthermore, the intricacies and diverse facets of human intelligence, including the capacity to discern connections, exhibit skepticism, and engage in inquiry, are elements that machines, including AI, struggle to replicate. While AI excels at extracting and analyzing data, the necessity for human intervention to complete the analysis raises questions about the true nature of AI's intelligence–whether it is genuinely intelligent or merely a tool akin to other machines.

References :

1. Accountants, P. I. (2018, June 4). Accounting Automation: A Threat to CPAs or an Opportunity. *PICPA* https://www.picpa.org/articles/picpanews/2018/06/04/pa-cpa-journal-accounting automation-a-threat-to-cpas-or-anopportunity.
2. Alton, L. (2017, September 12). How much do a company's ethics matter in the modern professional climate ? *Forbes*. https://www.forbes.com/sites/larryalton/2017/09/12/how-much-do-a-company sethics-matter-in-the-modern-professional-climate/?sh=581b4f401c79.
3. Baldwin, A., Brown, C. E., & Trinkle, B. S. (2006). Opportunities for Artificial Intelligence Development in the Accounting Domain: The Case for Auditing. Intelligent Systems inAccounting, Finance & Management, Wiley, 14(3), 77-86, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/isaf.277.
4. Best, Jo. , (2013, Sep 9). *IBM Watson*. TechRepublic. https://www.techrepublic.com/article/ibm-watson-the-inside-story-of-how-thejeo pardywinning-supercomputer-was-born-and-what-it-wants-to-do-next/
5. Boillet, J. (2020, Oct 15). *How to make the most of AI in corporate reporting*. EY. https://www.ey.com/en_us/audit/how-to-make-the-most-of-ai-in-corporate-reporting.
6. Brands, K., Smith, P. (2016). Ready or Not, Here Comes Accounting Automation. *Strategic Finance*, 97(9), 70-71. https://sfmagazine.com/post-entry/march-2016-ready-or-not-here-comes-account ing61automation/
7. Copeland, B. (2020, August 11). *Artificial intelligence*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence.

8. CPA Canada. (2019). *Big Data and Artificial Intelligence*-The Future of Accounting and Finance.
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-andsupport/docs/02041-rg-big-data-ai-future-of-accounting-finance-january-2019.pdf?la=en&hash=A0DD0BB6237E438A90974C7A3BA73DC0B6D23BD5.
9. Deloitte US (29 Nov. 2017) *Automated Document Review: Case Study | Market Development*. Deloitte U.S. www2.deloitte.com/us/en/pages/aboutdeloitte/articles/business-innovationautomated-document-review.html.
10. Dickey, G., Blanke, S., & Seaton, L. (2019). Machine Learning in Auditing. *CPA Journal*, 89(6),16-21. https://www.cpajournal.com/2019/06/19/machine-learningin-auditing/
11. Dickson, B. (2020). Everything you need to know about narrow AI. Newstex.
12. Douglas, J. (Nov 7, 2019). *These American workers are the most afraid of A.I. taking their jobs*. CNBC Newsletter.
https://www.cnbc.com/2019/11/07/these-american-workers-are-the-most-afraid-ofai-taking-their-jobs.html.
13. EY. (2018, April 30). The Growing Impact of AI on Business. *MIT Technology Review.*
https://www.technologyreview.com/2018/04/30/143136/the-growing-impact-of-aion-business/.
14. Frederick, Schwartz. (2014). *Reading and cases in corporate morality*. Wiley. P 571.
15. FSN Publishing Limited. (2017) Future of the finance function survey 2017 - *FSN*.
https://fsn.co.uk/app/uploads/2019/01/Future-of-the-Finance-Function-Survey-2017.pdf.
16. Gamage, P (2016). 'Big Data: are accounting educators ready?', *Accounting and Management Information Systems*, vol. 15, no. 3, pp. 588-604.
http://online-cig.ase.ro/RePEc/ami/articles/15_3_7.pdf.
17. Gardner, H. (2011). Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences. Ukraine : Basic Books.
18. Greenberg, P., Wolf, M. (2021, September 15). Legislation Related to Artificial Intelligence. *NCSL*
https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/2020- legslation-related-to-artificial-intelligence.aspx.
19. Gustein, A.J., Sviokla, J. (2018). 7 Skills That Aren't About to Be Automated. *Harvard Business Review.*
https://hbr.org/2018/07/7-skills-that-arent-about-to-be-automated.
20. Harford, T. (2019, May 21). *How computing's first 'killer app' changed every-*

thing. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-47802280.
21. Hirst, T (2014), 'Does technological innovation increase unemployment?', *World Economic Forum*. https://www.weforum.org/agenda/2014/11/does-technological-innovation-increaseunemployment/.
22. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (2018), Artificial intelligenceand the future of accountancy. *ICAEW* https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx?la=en.
23. ICAEW. (2018) *Deloitte remains the world's largest firm*. ICAEW https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/archive/deloitte-remainsworlds-largest-firm-pwc-ey-kpmg#:~:text=In%202017%20Deloitte%20increased%20its,bn%20(%C2%A326.81bn).
24. Issa, H., Ting Sun, & Vasarhelyi, M. A. (2016). Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing : The Formalization of Audit and Workforce Supplementation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 13(2), 1-20. https://meridian.allenpress.com/jeta/article/13/2/1/115980/Research-Ideas-for-Artificial-Intelligence-in
25. Knowles-Cutler, A, Frey, C. & Osborne, M (2014), London Futures Agiletown : the relentlessmarch of technology and London's response, *Deloitte*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/uk-futures/london-futures-agiletown.pdf>.
26. Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). The Emergence of Artificial Intelligence : How Automation is Changing Auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(1), 115-122. https://doi.org/10.2308/jeta-51730.
27. Markoff, John. (1 Sept. 2016) *How Tech Giants Are Devising Real Ethics for Artificial Intelligence*. The New York Times https://www.nytimes.com/2016/09/02/technology/artificial-intelligence-ethics.html.
28. McCarthy, John, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon. (2006.) A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. *Academic Search Complete*.
29. McKinsey Global Institute. (2017). A future that works: automation, employment and productivity. *McKinsey & Company*. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx.63
30. McKinsey Global Institute (2018). What can history teach us about technology and jobs ? *McKinsey &Company*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/

future-of-work/what-can-history-teach-us-about-technology-and-jobs.
31. Mensel, L. & Tholl, M. (2017). Jeremy Rifkin: In the New Economy, Social Skills Counts More Than Work Skills. *The World Post*. <https://www.huffingtonpost.com/2015/03/02/rifkin-new-economy-socialskills_n_6777646.html>.
32. Merriam Webster (2021). *Intelligence*. merriamwebster.com.
33. Meyer, C. (2019, September 10). What your students need to know about tech. *Journal of Accountancy*. https://www.journalofaccountancy.com/newsletters/extra-credit/technology-in-accounting-education.html.
34. Moudud-Ul-Huq, S. (2014). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Accounting Systems : A Review. *IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices*, 13(2), 7-19.
35. Munoko, I., Brown-Liburd, H. L., & Vasarhelyi, M. (2020). The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 209-234.
36. Nickerson, M. A. (2019). AI : NEW RISKS AND REWARDS : Will reliance on AI increase accounting and financial fraud ? *Strategic Finance*, 26-31.
37. Omoteso, K. (2012). The application of artificial intelligence in auditing : Looking back to thefuture. *Expert Systems with Applications*, 39(9), 8490-8495. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.098
38. Peace, C. (2021) *Implications of Emerging Technologies on the Accounting Profession* [Undergraduate Honors Theses, East Tennessee State University]. Paper 616. https://dc.etsu.edu/honors/616
39. Peccarelli, Brian. (27 Mar. 2017). The Robo-Accountants Are Coming. *CFO*. https://www.cfo.com/accounting/2016/05/robo-accountants-coming/
40. Rainie, L., Anderson, J., & Vogels, E. A. (2021, June 25). 1. worries about developments in AI. *Pew Research Center: Internet, Science & Tech*. https://www.pewresearch.org/internet/2021/06/16/1-worries-about-developments-in-ai/.
41. Rahul, Kumar, (Nov. 2018). Spotting Earnings Manipulation : Using Machine Learning for Financial Fraud Detection. *Lecture Notes in Computer Science Artificial Intelligence* XXXV,, pp. 343-356., https://doi.org/:10.1007/978-3-030-04191-5_29.
42. Sage. (2018). *Accountants' adoption of artificial intelligence expected to increase as* clients' expectations *shift*. Sage https://www.sage.com/en-us/news/press-releases/2018/03/accountants-adoption of-ai-expected-to-increase/.
43. Schatsky, David, Craig Muraskin, and Ragu Gurumurthy. (26 Jan. 2015.) Cognitive Technologies : The Real Opportunities for Business. *Deloitte University Press*,

Issue 16
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-16/cognitive-technologies-business-applications.html.
44. Shirer, M. (2021, February 23). IDC forecasts Improved growth for Global AI market in 2021. *IDC* https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47482321.
45. Smith, C. S. (2021, February 23). *A.I. here, there, everywhere*. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2021/02/23/technology/ai-innovation-privacy-seniorseducation.html.
46. Stancheva, E. (2018). HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS CHALLENGING ACCOUNTING PROFESSION. *Journal of International Scientific Publications*, 12. 126-141.
https://www.researchgate.net/publication/333728223_ HOW_ARTIFICIAL_INTEL LIGENCE_IS_CHALLENGING_ACCOUNTING_PROFESSION
47. Stein, Sarah. (3 Jan. 2017) *Developing Tomorrow's Auditor*. FEI www.financialexecutives.org/Topics/Accounting/Developing-Tomorrow-sAuditor.aspx.
48. Stewart, I., De, D., & Cole, A. (2015). Technology and people: The great jobcreating machine. *Deloitte LLP publishings*
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitteuk-technology-and-people.pdf>
49. Suton, S. Holt, M. & Arnold, V. (2016). The reports of my death are greatly exaggerated-Artificial intelligence research in accounting, International Journal of Accounting *Information Systems*, vol. 22, pp. 60-73.
50. 117th Congress. (2021-2022). *Text - H.R.3855 - H.R.3855 - Accounting STEM Pursuit Act of 2021* https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3855/text.
51. Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59, 433-460. https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
52. Urban, T. (22 Jan. 2015). *The AI Revolution : The Road to Superintelligence*. Wait But Why. https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
53. Vetter, A. (20 Jan. 2021). Voices Embracing the AI Wave. Accounting Today.
https://www.accountingtoday.com/opinion/embracing-the-ai-wave
54. Weber, L. (2018). *AI will kill creative, ai will save creative*. Accenture.
https://www.accenture.com/gb-en/blogs/blogs-ai-will-kill-creative-ai-will-save-creative.
55. WebFX.https://www.webfx.com/internet-marketing/ai-pricing.html.
56. *WEF* (2016). Chapter 1: The Future of Jobs and Skills. *WEF*

https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-andskills/.
57. Weizenbaum, J. (1956). Eliza-a computer program for the study of natural lan65 guage communication between man and Machine. Joseph Weizenbaum's ELIZA. *Communications of the ACM*, January 1966. https://www.csee.umbc.edu/courses/331/papers/eliza.html.
58. Wheaton, J., & Nguyen, A. (2019, November 27). 3 things AI can already do for your company. *Harvard Business Review.* https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world.
59. Yang, DC. & Vasarhelyi, MA. (1995). The Application of Expert Systems in Accounting. *Rutgers University Press* http://raw.rutgers.edu/MiklosVasarhelyi/Resume%20Articles/CHAPTERS%20IN%20BOOKS/C10.%20expert%20systems %20app%20in% 20act.pdf.
60. Akriti Aryal (29 March, 2022). Embracing Artificial intelligence in Accounting.

Supriyo Kumar Saha
Assistant Professor
Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalata
Nadia

ISSN: 2249-4332

Journal Guidelines

Submission of Manuscript

All papers must be submitted to journalopeneyes@gmail.com

The corresponding author will get a reply in a return mail. After an initial evaluation, the paper will be sent out for external peer review. While Open Eyes aims to notify authors of acceptance, rejection, or need for revision within three months of submission, the high volume of submissions and demands on referees may not always permit attaining this target evaluation and peer review timeline. Nevertheless, Open Eyes aims to have manuscripts reviewed within six months.

Ethical Responsibilities of Authors

This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. The journal will follow the **COPE** guidelines on how to deal with potential acts of misconduct. Articles submitted for publication must be original, not published previously, and not being considered for publication elsewhere.

No requirement of publication fee

Open Eyes does not require payment from authors to publish their papers in the journal. All submissions undergo the same rigorous process of evaluation and peer review.

Scope of Publication

Open Eyes publishes papers related to the areas of Social Sciences, Commerce and Humanities

Open Eyes Style Guide (For details consult the website)

Submission Format

Articles must be in Bengal or in English (British) with the content arranged as follows :

The first page of the article should contain title of the article; author's complete name, affiliation, and address (omit social titles). Also include an abstract (maximum of 300 words) and Keywords.

The main text will not carry the name of the author and will constitute separate word file. For references use MLA style (8th ed.) (Author-date format).

The length of each article must not exceed 6,000 words. References should be limited to literature cited only in the main text. The manuscript must be submitted as an MS Word file, font size 12, typed 1.5 spaces on A4 paper setting.

Tables, Figures

Each table and figure (accompanied by the original tabulated data) must be on a separate sheet of paper, numbered in order, and placed at the end of the article. To facilitate layout and typesetting, the editable files of the tables and figures will be required when a paper is accepted for publication.

Text for tables should not be smaller than 9 points. Scanned or digital photos should be of high resolution (minimum of 300 dpi).

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 21, No. 2, December 2024

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only